ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

পঞ্চবিংশ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

পঞ্চবিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯
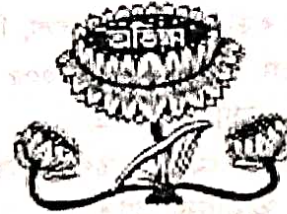
—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—
— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক—পয়ঁষট্টি টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

পঞ্চবিংশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭৩ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার পঞ্চবিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে চতুর্বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" পঞ্চবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

এই পঞ্চবিংশ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের হুবহু পুণর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(পঞ্চবিংশ খণ্ড)

—ঃ*ঃ—

(১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ জানিও।

মা উ—র পত্রে জানিয়া খুবই সুখী হইলাম যে, সমবেত উপাসনায় তোমার অত্যধিক রুচি। আমার মায়েরা ও বাবারা প্রত্যেকে সমবেত উপাসনার প্রতি আগ্রহশীল হউক, নিয়ত এই একটী কামনাকে অন্তরে জপের মালা করিয়াছি। আমি বিশ্বের সকলকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বনাথের অর্চ্চনা করিতে চাহি, গুরু সাজিয়া পূজার আসনে বসিবার আমার সাধ নাই। তোমাদের মধ্যে সমবেত উপাসনার প্রতি যাহারা অত্যধিক আকৃষ্ট, তাহারা প্রতিজনে দিনের পর দিন আমার অন্তরতর হইতে অন্তরতম হইতেছে। এই একটী কথায় যাহার বিশ্বাস আসিবে, একদা সে

আমার সহিত এবং বিশ্বপুরুষ বিশ্বাত্মার সহিত অবাধে নিজ একাত্বকে, নিজ অভেদত্বকে, নিজ অভিন্ন-সত্তাকে উপলব্ধিতে আনিয়া অজ্ঞান-তিমিরান্ধত্ব হইতে নিত্যমুক্তি লাভ করিবে। জগতের প্রতিজনের মুক্তিই আমাদের কাম্য। বিশ্বের একটী প্রাণীকে আমরা পিছে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে চাহি না।

সমবেত উপাসনায় যাহার অনুরাগ, সে আমার পরম প্রিয় অনায়াসেই বুঝিতে পার, আমার প্রতি যাহার অনুরাগ, সে সমবেত উপাসনাকে অনাদর করিতে পারে না। সমবেত উপাসনার স্নিগ্ধ দিব্যতা দিয়া তোমরা জগৎকে মধুময় করিয়া ফেল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিবাহ করিয়া থাকিলে তোমাকে তোমার স্ত্রীকে সহায়িকা রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীকে একেবারে দূরে ঠেলিয়া দিয়া নিজে একা একা বিশুদ্ধ কাঞ্চন হইবার চেষ্টা করিলে কোনও কোনও স্থলে স্ত্রী জীবনে অধোগতি আসিতে পারে। সংযমেচ্ছু স্বামীর এই জন্যই জীবনব্রত বড় কঠোর, বড় কঠিন। কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই সফলকাম হইতে পারে। এই বিশ্বাসটী রাখিও।

আড়াই বৎসর যাবৎ স্ত্রীসঙ্গ কর না, ইহা একটা মস্তবড় কথা। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা একটী সপ্তাহ স্ত্রীসহবাস না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাদের মন এত দুর্ব্বল যে, স্বাস্থ্যের যুক্তি, ধর্ম্মবোধের তাগিদ বা অন্য কোনও প্রকার বিবেচনা ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, ইহারা অভ্যাসের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। চেষ্টা করিয়া নিজেকে অভ্যাসের প্রভু রূপে প্রতিষ্ঠা যে করা যায়, ইহা পর্য্যন্ত ইহাদের ধ্যানে বা জ্ঞানে আসে না। দেশের এইরূপই যখন হীনাবস্থা, তখন তোমার আড়াই-বৎসরব্যাপী স্ত্রীসংসর্গ বর্জ্জনকে নিশ্চয়ই সপ্রশংস অভিনন্দন দিতে হইবে।

কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জন একক ভাবে খুব বড় একটা কাজ নহে। জেলখানায় যাহারা বন্দী থাকে বা যুদ্ধশিবিরে যাহারা বাস করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের নিকটে স্ত্রীসঙ্গ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব যেকোনও প্রকারে স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া রহিতে পারিলেই খুব বড় রকমের একটা কৃতিত্ব অর্জ্জিত হইয়া গেল না। স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত জীবনায়ুটুকুকে দিব্য জীবন লাভের আকূতি দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। কাণায় কাণায় জল ভরা থাকিলে সেই কলসীতে যেমন আর নূতন জল প্রবেশ করান সহজ নহে, ঠিক তেমনি অন্তর দিব্য জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় কাণায় কাণায় পূর্ণ থাকিলে তাহার মধ্যে জান্তব কামনা সহজে প্রবেশ করিতে

পারে না। সুতরাং তোমার এখন প্রয়োজন হইতেছে দিব্য জীবন লাভের জন্য প্রচণ্ড ভাবে ব্যাকুল হওয়া।

যে নাম গুরুমুখে পাইয়াছ, তাহাতে অক্লান্ত নিষ্ঠায় লাগিয়া থাক। নাম করিতে করিতে অন্তরে প্রেমের উদয় হইবে। প্রেম-শশী হৃদ্‌গগনে উদিত হইলে সকল সংশয়, সকল অন্ধকার, সকল নিরানন্দ চিত্তাবস্থা নিমেষে দূর হইয়া যাইবে। নামে নির্ভর কর, নামকে জীবনের জীবন বলিয়া জ্ঞান কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার দোকানের কর্ম্মচারীরা জনে জনে নানা সম্প্রদায়ের গুরুর নিকট দীক্ষিত বলিয়া তাহাদের কাহারও ধর্ম্মাচরণের তুমি বিরোধ করিও না। জাপানে একই পরিবারে কেহ বৌদ্ধ, কেহ খ্রীষ্টান, কেহ মুসলমান থাকে বলিয়া শুনিয়াছি কিন্তু সেই পরিবারের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি আছে বলিয়া শোনা যায় না। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমরা প্রতিজনে যথেষ্ট শিক্ষা ও প্রেরণা সংগ্রহ করিতে পারি। তুমি তোমার দোকান-কর্ম্মচারীদের

প্রতিজনকে নিজ নিজ স্বাধীন ধর্ম্মপথে চলিবার যথেষ্ট অবকাশ দাও, তাহা আমি জানি। ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুদেবেরা সহরে আসিলে তুমিই গিয়া আগ বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা দাও, তাহাও আমি জানি। ভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎসবাদিতে তুমি অকাতরে অর্থ দান করিয়া থাক, ইহাও আমি জানি। কিন্তু তথাপি এই পত্রখানা তোমাকে অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে লিখিলাম। তাহার কারণ এই যে, অদ্য এখানে একটী যুবক কর্ম্মী আশ্রমে শ্রমদানের জন্য আসিয়াছে, যে বলিল, সে কাছাড়ের একটী সহরে একজন ধার্ম্মিক দোকানদারের দোকানে কাজ করিত কিন্তু যেহেতু মালিক কোনও নির্দ্দিষ্ট একটী মঠের শিষ্য, সেই হেতু যুবকটীকে তাহার নিজ সঙ্গের সমবেত উপাসনায় যাইতে দেওয়া হইত না। বলা হইত, তোমাদের উপাসনা ত' একটা দোকানদারী, তোমাদের ধর্ম্মমত ত' একটা ব্যবসায়, তোমাদের গুরুদেব ত' একজন বচন-বাগীশ, তোমাদের সঙ্ঘ ত' একটা গুণ্ডার আড্ডা। যুবকটী এমন মালিকের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া যে ভাল কাজ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার দোকানে তুমি যদি তোমার কর্ম্মচারীর সহিত এইরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করিতে পরিতাম না। ধর্ম্মীয় সঙ্কীর্ণতা মানুষকে এমন নীচ স্থানে নিয়া ফেলিতেছে যে, ডাকের চিঠি, টেলিগ্রাম, মানিঅর্ডার, রেলের রিজারভেশান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত তাহারা আক্রমণ করিতেছে। দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া যাই

যে, ধর্ম্মে অনুরাগের নাম করিয়া মানুষ বিদ্বেষের এত চর্চ্চা করিতে পারে। এই জন্যই তোমাদিগকে আমার বলিবার প্রয়োজন আছে যে, এই সকল হীন আচরণ দেখিয়া তোমরা হীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে কদাচ আগ্রহী হইও না।

ধর্ম্মমতে ধর্ম্মমতে পন্থা, উপায়, সাধন ও সাধ্য বিষয় লইয়া মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে। তাহা চিরকাল থাকিবে। কিন্তু ধর্ম্ম যেন ইহার অবলম্বনকারীকে অমানুষ হইতে মানুষ করে, পশুত্ব হইতে রক্ষা করে, দেবোচিত প্রেমে যেন সকলের মনঃপ্রাণ ভরিয়া দেয়। ধর্ম্ম সকল জীবকে ভালবাসিতে শিখায়, ইহাই না ধর্ম্মের বিশেষত্ব! যে ধর্ম্মে জীবের প্রতি যত অধিক প্রেমের প্রেরণা, সেই ধর্ম্ম তত খাঁটি, তত সার্থক। আমার সন্তান বলিয়া যাহারা গৌরব বোধ কর, তাহারা এই বিষয়ে নিয়ত সচেতন থাকিও।

ব্রাহ্মণ আর অব্রাহ্মণে যে অপ্রেম কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতীকার করিতে আসিয়া অবতার-বিশেষের শিষ্যরা অন্য অবতারের শিষ্যদের অবজ্ঞা করিবে, ইহা কোনও স্থিরবুদ্ধির কথা নহে। আবার ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ-কুলের পূজাস্থানে বসাইবার জন্য যে সকল ধর্ম্মান্দোলন চলিতেছে, তাহাতে, শূদ্রসন্তান প্রণবমন্ত্র জপ করিলে কামুক হইবে বা নরকস্থ হইবে, ইত্যাদি মিথ্যা অপকথার প্রচার দ্বারা বেদ-সার ওঙ্কারকে অসম্মান করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রণবজাপকের মনে ক্লেশ দেওয়াও প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ নহে। হিংসা এবং বিদ্বেষের ঊর্দ্ধে সকলকে

উঠিতে হইবে এবং এইজন্য অন্তরের উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা চাই। মহাপুরুষেরা যেই যুগে যেই ভাবেই মানুষকে পরিচালিত করিতে চাহিয়া থাকুন, হিংসা-বিদ্বেষের প্রশ্রয় কদাচ তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত বা তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তোমরা প্রত্যেকে সাধন-নিষ্ঠ হও। ভগবানের নামে প্রতিজনে প্রাণমন মজাও। নামের রস আস্বাদন করিতে করিতে দিব্যানন্দের অধিকারী হও। অকৈতব প্রেম তোমাদের সহজ স্বভাবে পরিণত হউক। নিখিল বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীকে আপন ভাবিয়া, আপন জানিয়া, আপন করিয়া তোমরা মনুষ্যজনম সার্থক কর। বিশ্বের সকলে এক হইবে, এই জন্যই সহস্র সহস্র প্রকৃত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তোমাদের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে তাঁহাদের আবির্ভাব সার্থক হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১৩ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৭৩

(৩০-১০-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা প্রত্যেকেই আমার আপনার আপন, ইহা মনে রাখিও

এবং বিশ্বের প্রত্যেককে তোমরা আপনার জনে পরিণত করিবে, এই সঙ্কল্পে আরূঢ় হইও।

মেচ সম্প্রদায় দলে দলে খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। খ্রীষ্টধর্ম্ম খারাপ, এমন কথা বলি না। খ্রীষ্টপ্রদর্শিত মার্গ অনুত্তম, তাহা বলিতে চাহি না। কিন্তু কোনও কোনও ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরে ভারতের সন্তানেরা ভারত-দ্বেষী হইয়া উঠিতেছে, ইহা বেশ কিছুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। ভারতীয়ত্বের বিদ্বেষ যাহাতে ভারতের বুকে বর্দ্ধিত হইতে না পারে, তাহার জন্য কোনও কোনও ধর্ম্মের প্রচারকদের সম্পর্কে প্রত্যেক ভারতীয়ের একটী সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট কর্ম্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়িয়াছে। ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন রাষ্ট্রকর্ণধারেরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধের ন্যায় চলিতেছেন বলিয়া আজ এই বিষয়ে তোমাদের প্রত্যেকের সচেতনতা একান্তই আবশ্যক। ধর্ম্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রতি প্রশ্রয়-দানের অভিপ্রায় আমার নাই, কিন্তু ভারতকে আমি ভালবাসি।

তোমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মেচ জাতির অন্তরের অন্তরে দ্রুত প্রবেশ কর। ইহাদের আত্মার ক্ষুধা, ঈশ্বরপ্রীতি-সাধনের আকূতি, আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সব আমি মহাসমাদরে মিটাইয়া দিব। তজ্জন্য আমি প্রস্তুত রহিলাম। ইহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অবহেলা না করিয়া তোমরা দলে নলে ইহাদের মধ্যে অখণ্ড-আদর্শের বিজয়ধর্ম্ম লইয়া প্রবেশ

কর। ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যেই ইহাদের সহজ স্ফূর্ত্তি এবং স্বাভাবিক মুক্তি ঘটিবে।

একদল উগ্র ব্রাহ্মণতা-সমর্থক হিন্দু গুরুদেবেরা আজও ভারতের কোটি কোটি বনপর্ব্বতবাসী অজানা অচেনা ভারতীয়কে শূদ্র বা শূদ্রাধম বলিয়া দূরে রাখিবার জন্য বহু-সম্পদ-সম্বর্দ্ধিত আন্দোলন চালাইতেছেন। ইঁহারা বুঝিতেছেন না, নিজেদের পায়ে কুঠার হানিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এই সকল গুরুদেবদের কাহারও কাহারও লোকপ্রতিষ্ঠা এত অধিক যে, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, গবেষক ও বিচারপরায়ণ ধুরন্ধর ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকে এই অপ-আন্দোলনে যোগদান করিতে গৌরব বোধ করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক যদি বিজ্ঞান না বোঝে, ঐতিহাসিক যদি ইতিহাস ভুলিয়া যায়, দার্শনিক যদি যুক্তিনিষ্ঠা হারায়, তাহা হইলে এমন কাণ্ডারীর হাতে ঝড়ের নৌকা তীর ছাড়িবার আগেই ডুবিয়া যায়।—তোমরা এই সকল আন্দোলনকারীদের উচ্চ চীৎকারে কর্ণপাত করিও না। তাঁহারা অন্ধ বিশ্বাসে ভর করিয়া যাহা কহিতেছেন, তাহাতে জাতিবৈরই বাড়িতেছে। তোমরা ডিমাছা, মিকির, মেচ, রাজবংশী, কাছাড়ি এবং অন্যান্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ছোট, মাঝারি, বড় সব অবহেলিত জাতিকে কোল দিয়া কূলে তোল। প্রেমই তোমাদের সম্বল, বিদ্বেষ নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-রেল-ষ্টেশনটীতে তোমরা পাহাড়ী ভাইবোনদের সকলকে লইয়া শারদীয়া অখণ্ডোপাসনা মহা-সমারোহে সমাপন করিতেছ জানিয়া বড়ই সুখানুভব করিলাম। অবজ্ঞাতদের বুঝিতে দাও যে শ্রেষ্ঠ-তত্ত্বে, শ্রেষ্ঠ-সাধনে, শ্রেষ্ঠ-পন্থায় তাহাদের অধিকার আছে। সকলের দাস করিয়া রাখিবার জন্য অনার্য্যদিগকে প্রাচীন আর্য্যেরা নিজেদের সমীপস্থ করেন নাই। ছোটকে তাঁহারা বড় করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। ইহারই ফলে আজিকার অনেক ব্রাহ্মণ-কুলের বংশপ্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষ অব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণবরিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অধিকারিভেদ নামক একটী চমৎকার দার্শনিক বিচারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া একদল লোক চিরকাল অপর একদলের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়াছেন, ইতিহাসের সত্য ইহা নহে। ছোটকে বড়, তুচ্ছকে মহৎ, দুর্ব্বলকে সবল, দূরকে নিকট, হেয়কে সম্মাননীয় এবং সাধারণকে অসাধারণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা জগৎ-সভ্যতার ইতিবৃত্তে মহাদুর্দ্ধর্ষ-রণনেতাদের চেয়েও সহস্র গুণে বরণীয়। তোমরা

তোমাদের পাহাড়ী ভাইবোনদের সৎ, মহৎ, বিস্তারশীল, শক্তিমান, সদাচারী ও সত্যনিষ্ঠ করিয়া গড়িয়া তুলিয়া জগতে কীর্ত্তি স্থাপন কর।

উৎসাহ-সঞ্জননের জন্য উৎসবাদির প্রয়োজন আছে। এক একটা উৎসব অনেক ভাবধারাকে যুগযুগব্যাপী করিয়া দিতে পারে। হুজুগ নহে, যুগ-জাগরণ তোমাদের উৎসবের লক্ষ্য হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৭ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩
(৩-১১-৬৬ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সে-ই প্রকৃত পুত্র, পিতার দায় নিজে সারধিয়া যে স্কন্ধে নেয়। জগতে এমন পিতা কে আছে, যে নিজ পুত্রের কাছে এই প্রত্যাশাটুকু করিবে না? যাহারা পুত্রকন্যার চরিত্র-ভাগ্যে নিতান্তই বিড়ম্বিত ও বঞ্চিত, মাত্র তাহারাই বলিবে, চাহি না পুত্রকন্যার সাহায্য, চাহি না তাহাদের সেবা।

গুরুশিষ্য সম্পর্কেও এই কথাই খাটে। গুরু হয় ত' প্রত্যাশা করিবেন না, কারণ, শিষ্যের উপরে নির্ভর অপেক্ষা তাঁহার ঈশ্বরে

নির্ভর বেশী। শিষ্য হয় ত' গুরুর আদর্শকে প্রসারিত করিল না, বাহিরের লোক আসিয়া তাহা করিতে পারে। বান্দা যে গুরু গোবিন্দ সিংহের সামরিক ও সাংগঠনিক আদর্শকে গোবিন্দ-শিষ্য-নামধারী অন্য যে-কোনও শিখের অপেক্ষা বেশী রূপায়ন করিতে চেষ্টিত ও সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-বেত্তারা স্বীকার করিয়া থাকেন। বান্দার অসামান্য কর্ম্মোদ্যমে যে শিখ-সাধারণ আসিয়া নিজ নিজ শক্তিকে সংযোজিত করেন নাই, তাহার প্রধান কারণই ত' এই যে, তিনি কতকগুলি বিষয়ে গুরুগোবিন্দ হইতে পৃথক্ ছিলেন। বান্দা যদি গুরুর পাঞ্জা পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত শিখের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়-যোজনা হইতে পারিত। বান্দা বৈষ্ণবের ছেলে, বৈষ্ণব-সাধনে চরণশীল, বান্দাকে গুরুগোবিন্দ পাইলেন একান্তই ঈশ্বরাভিপ্রায়ে।

অনেক শিষ্যই গুরুদেবের মত, পথ ও আদর্শকে জগতে প্রচারিত, প্রসারিত ও উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শিষ্য নহেন, এমন ব্যক্তিরাও যে শিষ্যাধিক আনুগত্য নিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আসে যে, বিশ্বমানবের প্রতি যাঁহার সম্প্রদায়বুদ্ধিহীন উদার প্রেম, তাঁহার ভাব ও বাণী জগৎকে উপহার দিবার জন্য প্রথাগত শিষ্যেরাই একমাত্র অবলম্বন নহে।

এইরূপ স্থলে শিষ্যকুলের মর্য্যাদা একটু কমিয়া গেল বলিয়া নিশ্চয়ই মনে হইবে। কিন্তু যাঁহারা জগদ্‌গুরু, তাঁহাদের শিষ্য ত' বর্ত্তমান ও অনাগত যুগ ধরিয়া সমগ্র জগদ্বাসীরাই হইবে। সুতরাং

আলাদা করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট ঢংয়ের শিষ্যকুলের প্রতি তাঁহার তাকাইবার প্রয়োজন কি?

আমি অধিকাংশ সময়ে চিন্তার এই অধিষ্ঠান-ভূমিতে বিচরণ করি। এই জন্যই আমি শিষ্যনামধারীদিগকে আমার কর্ম্ম ও প্রয়াসগুলিতে অকারণে জড়িত করিতে সাধারণতঃ আগ্রহী হই না। তবে, প্রকৃত শিষ্য যাহারা, তাহারা নিজেদের ভক্তির মহিমায় আপনিই বুঝিয়া লইবে যে, কি কি তাহাদের অবশ্য-করণীয় এবং আশুকর্ত্তব্য। নিজের কর্ত্তব্য নিজে বুঝিতে পারা অবশ্য বুদ্ধি-নির্ভর ও জ্ঞান-সাপেক্ষ। তোমরা যদি সাধন কর, তবে ত' বুদ্ধি নির্ভুল পথে চলিবে, তবে ত' জ্ঞান পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তুমি একটী গুরুতর কাজ তোমার নিজ স্কন্ধে যাচিয়া নিলে। ভালই করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, কর্ত্তব্য পালন করিয়া আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৫ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৭৩

(২১-১১-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। গুরুদ্রোহীকে আপ্যায়ন করার প্রকৃত অর্থ গুরুদ্রোহকে প্রশ্রয় দেওয়া। এ কথা জলের মত শাদা; তোমরা যদি শক্তিশালী সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে চাও, তবে তাহার বনিয়াদ হইবে গুরুভক্তি। এ কথা প্রত্যেক ধর্ম্মসঙ্ঘ মানিয়া থাকেন। যেখানে সঙ্ঘের কোনও বালাই নাই, গুরুর সহিত শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কটুকুই চূড়ান্ত, সেখানে কে গুরুদ্রোহী আর কে গুরুদেবের আদর্শের অনুগত, ইহা নিয়া দ্বন্দ্ব উঠিবার হেতু নাই। ব্যক্তিগত ভাবে কোনও শিষ্য গুরুদ্রোহী হইলে ক্ষমাশীল এবং ক্ষমতাবান্ গুরু সানন্দ অন্তরে শিষ্যের দ্রোহ ও রুদ্র তেজ সহিয়া নিবেন এবং নেন। কিন্তু যেখানে গুরুদ্রোহের অর্থ হইবে সঙ্ঘের একনিষ্ঠা, একলক্ষ্যতা, দৃঢ় সঙ্কল্প এবং আত্মোৎসর্গের কামনাকে শিথিল, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করা, সেখানে গুরুদ্রোহ সহনীয়ও নহে, ক্ষমার্হও নহে। সঙ্ঘ যেন একটা ছোটখাট রাষ্ট্র। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তি অন্যায় করিলে মানুষ তাহা ক্ষমা করিতে পারেন এবং সাধ্যমত ক্ষমা করাই উচিত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি কেহ দ্রোহ করিলে ব্যক্তির অধিকার নাই সেই অন্যায়ের ক্ষমা করিবার। রাষ্ট্র বহু ব্যক্তির সমষ্টি। সমষ্টির যে ক্ষতি করিতে চাহিবে, ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেও সে ক্ষমা পায় না। অন্য ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাকে শাসন করে, দমন করে। গুরু যখন একক তোমার গুরু, তখন তুমি দ্রোহ করিলে নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করিবেন এবং ক্ষমা করিবার শক্তি না থাকিলে তিনি

গুরুপদবাচ্যই নহেন। যিনি ক্ষমায় অক্ষম, তিনি নিতান্তই লঘু। যিনি লঘু, তিনি কদাচ গুরু হইবার যোগ্য নহেন। যিনি বহুজনের গুরু, তাঁহাকেও কোনও একটী শিষ্য না মানিলে গুরু তাহাতে রুষ্ট হইতে পারেন না। কিন্তু যেখানে গুরু নিজের নিজস্বতা বিসর্জ্জন দিয়া একটা আদর্শের চরণে নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছেন এবং সেই আদর্শের মোহন-বেণু-ধ্বনি অসংখ্য নরনারীকে অপরিচয়ের দূরান্ত অতিক্রম করাইয়া পরমাত্মীয়তার দিগন্ত দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, যেখানে ইহারা নানা দেশ, নানা সমাজ, নানা পরিবেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া অখণ্ড-মিলন-নিলয় রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেখানে বিশ্বের সকল বংশীর ঐক্য-সঙ্গীতের মাঝখানে বেসুরা পেচক-চীৎকার কে সহ্য করিবে? গুরু ক্ষমাশীল, তিনি সবই সহ্য করিবেন কিন্তু সঙ্ঘ গতিশীল, সঙ্ঘ বর্দ্ধনশীল, সঙ্ঘ কর্ম্মপরায়ণ, রণপ্রবৃত্ত, নিয়ত-ক্রিয়ান্বিত। সে কেন তাহার গতি, তাহার বৃদ্ধি, ক্রিয়া, কর্ম্ম, সংগ্রাম ও দিগ্বিজয়ের পথে রথচক্রের বাধাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিবে? দিলে, সে নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি দ্রোহ করিবে, নিজের নিষ্ঠা হারাইবে। সঙ্ঘকে কেহ এমন ক্ষতির মুখে পড়িতে দিতে পারে না। তবে যাহারা হৃদয়ে পাষাণ এবং মৌখিক যুক্তিতে দার্শনিক, যাহারা অন্তর্দ্দৃষ্টিতে ক্ষীণ এবং বাহ্য উদারতার বাহবা-প্রয়াসী, তেমন লোকদের কথা স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্রই এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহারা বাহ্যতঃ অন্তরঙ্গতা দেখাইয়া, অন্তরে অন্তরে তস্করের

প্রবেশ-পথই নির্ম্মাণ করে। এই জাতীয় বিবর-বাসী ছদ্মচারী কৌটিল্য-পন্থীদের কথা আলাদা। ইহারা সঙ্ঘের পায় না বিশ্বাস, সমাজের পায় না সম্ভ্রম, জীবনব্যাপী শ্রমে লাভ করে না কোনও প্রকারের কৌলীন্য। ইহারা জগতে কাহারও চোখেই আদর্শস্থানীয় নহে।

তুমি নিরভিমান চিত্তে তোমার কাজ করিয়া যাও। সকল পরকে আপন করার পথ প্রশস্ত কর। সকল দূরকে নিকট করার উপায় সহজতর কর। সকল ব্যবধানকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া জীবে জীবে প্রেমের সঞ্চার কর। এমন ভাবে কাজ কর যেন অপ্রেম, অশান্তি অচিরে দূর হইয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

বারাণসী
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আজ শেষ রাত্রিতে পুপুন্কীতে মঙ্গলকুটীরে বসিয়া তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়াছি। প্রাতে ৬॥ টায় গোমোতে আসিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ধরিয়াছি। রাত্রি দশটায় বারাণসী পৌছিয়াছি। এখন রাত্রি একটায় শুইতে যাইবার আগে তোমার পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলাম। কারণ, তুমি শোকার্ত্ত।

কিসের তোমার শোক? তোমার গুরুদেবকে একটী পাষণ্ড গুরুভ্রাতা নিন্দা করিয়াছে। তোমার গুরুদেবকে লোকচক্ষে হেয় করার জন্য এই ব্যক্তি প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছে। তুমি ক্ষুব্ধ হইয়াছ।

এই ক্ষোভ দূর কর। যাহারা অকপট-সাধন-রত, তাহাদের সঙ্গ কর। যাহারা সত্যে ও আদর্শে বিশ্বাসী, তাহাদের কাছে যাও। যাহারা ভক্তিবর্দ্ধক, নিষ্ঠাবর্দ্ধক, প্রেমবর্দ্ধক কথা ছাড়া কথা বলে না, যাহারা নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক জীবন ছাড়া অন্য জীবন যাপন করে না, তাহাদের সঙ্গ ধর। বৃথা কর্ম্ম ও চাতুরীপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা যাহারা নিজেদের মূল্য ও নীতির মান কমাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের সঙ্গ সযত্নে বর্জ্জন কর। সাধনে রুচিনাশক কথায় যাহাতে কর্ণপাত না করিতে হয়, তাহার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, সমগ্র পৃথিবীর সংসর্গ বর্জ্জন কর। তুমি নিজেকে একান্তে রাখিয়া তোমার পরম প্রেয়ের আরাধনা কর। অন্যত্র কে কোথায় কি কহিয়াছে আর কি করিতেছে, তাহার চিন্তা পর্য্যন্ত মন হইতে মুছিয়া দাও।

ভক্তি সকলের আসে না, সহজে আসে না। যাহার আসে, ঈশ্বরকৃপায়ই আসে। জগতের অধিকাংশ নরনারী ভক্তিহীন নীরস জীবন যাপন করিয়া যাইতেছে। কিন্তু জগতে ভক্তের বড়ই সম্মান। অনেক জ্ঞানীকেও ভক্তের এই অসামান্য লোকপ্রিয়তা দর্শনে অন্তরে ঈর্ষ্যানুভব করিতে লক্ষ্য করা গিয়াছে। জ্ঞানীকে জ্ঞানী ছাড়া অন্যে সহজে বুঝিতে পানে না। কর্ম্মীকে অধিকাংশ মানুষ নিতান্তই বাহ্য দৃষ্টিতে দেখে এবং অতীব লঘু বুদ্ধিতে বিচার করে। কিন্তু ভক্তকে দর্শন মাত্র অধিকাংশ মানুষের মনের যমুনায়

উজান বহিতে আরম্ভ করে। ইহা মানুষের, বলিতে গেলে, এক স্বভাব-সংস্কার।

এই কারণেই অনেকে ভক্তির প্রকৃত অধিকারী না হইয়াও ভক্তের প্রাপ্য পূজা ও সম্মান পাইবার জন্য বড়ই লালায়িত হয়। ইহারা কপটতার পথে পাদচারণ করিতে প্রলুব্ধ হয়। ইহারা অন্তরে ভক্তিহীনতার মরুভূমিতে অবিরাম উত্তপ্ত বালুকারাশি সংগ্রহ করিতে করিতেও বাহিরের বচন-বিলাসে ভক্তির সুরধনী-ধারা বহাইতে থাকে। ইহাদের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে অপরের প্রকৃত ভক্তির উৎসমুখে পাথর চাপা দিয়া থাকে।

এ সকল সঙ্গ বর্জ্জন কর। একান্তে একাগ্র চিত্তে নিজ মনঃপ্রাণ তোমার জীবন-প্রভুর চরণে উৎসর্গ করিতে থাক এবং প্রার্থনা কর,—"হে প্রভো, জগতের প্রতিটি প্রাণী নিত্যসৎ কল্যাণ-পথে পরিচালিত হউক।" ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

বারাণসী

৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৭৩

(২২-১১-৬৬)

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার যোগ্যতা আছে অথচ তাহার সদ্ব্যবহার করিবে না, ইহা কিরূপ কথা হইল? এটা করা সহজ, ওটা করা স্বাভাবিক, সেটা করা সঙ্গত,—এইরূপ উক্তি করিলেই ত' হইবে না! কাজটী করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, উহা সত্যই সহজ, সত্যই স্বাভাবিক, সত্যই সঙ্গত। যে কাজ সঙ্গত, তাহা করিতে গড়িমসি করা ভাল নয়। যে কাজ কঠিন, তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে তাহাও করিতেই হইবে। সে কাজও ফেলিয়া রাখা চলে না। তোমরা প্রতি জনে অবিলম্বে আত্মপরীক্ষায় নামো যে, কার কোন্ কাজের যোগ্যতা আছে। যার যতটুকু যোগ্যতা আছে, তাহাকে ততটুকু কাজ করিতেই হইবে।

বড় কাজ করিবার যোগ্যতা সকলের থাকে না কিন্তু ছোট ছোট কাজ করিবার ক্ষমতা কাহার নাই? ছোট ছোট কাজ নিষ্ঠার সহিত সমাধা করিতে করিতে বড় বড় কাজ করিবার যোগ্যতা আসিয়া যায়। কুচ-কাওয়াজে নামিয়াই সঙ্গে সঙ্গে কেহ কম্যানণ্ডার-ইন্-চীফ হইয়া যায় না। জগতের অনেক সাধারণ পদাতিক সৈন্য ধৈর্য্য, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের ফলে কাল-ক্রমে ভুবনজয়ী সেনাপতিতে পরিণত হইয়াছেন। সেনাপতি হইবার যোগ্যতা ক্ষুদ্র একটী বীজাণু রূপে তাঁহাদের মধ্যে ছিল বলিয়াই সামান্য পদাতিক রূপে তাঁহারা ছোট ছোট কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহারা ছোট ছোট কর্ত্তব্যকে তুচ্ছ করেন নাই বলিয়াই বড় বড় কর্ত্তব্যের

দায়িত্ব একদা তাঁহাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল। অনালস্য, অনবসাদ, অক্লান্ত উদ্যম, অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস ও অপরিমিত সৎসাহস তাঁহাদিগকে নিজ নিজ যোগ্যতার বিকাশে এবং যোগ্যতার প্রমাণ-প্রদানে সহায়তা করিয়াছিল।

আলস্য ত্যাগ কর। আতঙ্ক, আশঙ্কা, ভয়-ভীতি, দুর্ব্বলতা, সৎকাজে লজ্জা পরিহার কর। শুধু সৎ হইলেই চলিবে না, সৎসাহসও চাই। প্রকৃত সৎসাহস অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাহসের তুল্য কঠোর হয়। লোকে কি বলিবে, এই চিন্তায় বিব্রত হওয়া মারাত্মক ভুল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ বারাণসী

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দিবারাত্র নাম করিবার অভ্যাসটী আয়ত্ত করিয়া লও। নাম করার মতন এমন মধুর কাজ আর কিছু নাই কিন্তু অভ্যাস ছাড়া এ কাজে রুচি আসে না। অবিরাম অবিশ্রাম নাম করিবার রুচি আনিবার জন্যই প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নামে বসিবার অভ্যাসটীকে আগে আয়ত্ত করিতে হয়। ইহাতে একটা চেষ্টাকৃত শৃঙ্খলা আছে

বলিয়া নাম অনেক সময়ে বড় রুক্ষ, বড় শুষ্ক, বড় রসহীন বলিয়া মনে হয়। তবু ছাড়িতে নাই। তবু জোর করিয়াই নামে লাগিয়া থাকিতে হয়। লাগিয়া থাকিতে থাকিতে সৌভাগ্যের দুয়ারে হঠাৎ খুলিয়া যায়। সহসা একদিন অবাক্ হইয়া দেখিতে হয় যে, মন নাম ছাড়া আর কিছুই চাহে না।

ছুটিছাটা পাইলেই নাম করা যায়, তাহা নহে। অফুরন্ত নাম করিবার রুচি সৃষ্টির জন্য অভ্যাসও চাই। এই অভ্যাস যাহাদের না থাকে, তাহারা নিশ্চিন্ত অবসরে অথবা সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ অবস্থিতিতে একদিকে স্বাধ্যায় এবং অপর দিকে নামজপ, এই দুইটী পরপর চালাইয়া যাইবে। স্বাধ্যায় মানে নিজের প্রাপ্ত সাধনের প্রতি সাধনের প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তিবর্দ্ধক, সাধনে রতিবর্দ্ধক, সাধন-পন্থার সমর্থক সদ্গ্রন্থ পাঠ। নামজপ মানে দীক্ষাপ্রাপ্ত নামটীকেই একমাত্র অবলম্বনীয় জানিয়া তাহাতে অনন্যপ্রযত্ন হইয়া লাগিয়া থাকা। যতক্ষণ নামজপ ভাল লাগে, ততক্ষণ নামজপই চলিবে। যখন তাহাকে ক্লেশ, ক্লান্তি, অবসাদ, অরুচি বা অক্ষমতা অনুভূত হইবে, তখন স্বাধ্যায় চলিবে। অন্নই পেট ভরিয়া খাইতে হয়, চট্‌নি নহে। স্বাধ্যায় সাধনের চাটনি। নামজপ সাধনের পরমান্ন। জপ করিতে করিতে জপলক্ষ্যের ধ্যান আসে। অবিরাম জপ ধ্যানের সহায়ক। অনেকের পক্ষে ধ্যান জমান এক কঠিন ব্যাপার কিন্তু নামের অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক যে অবিরাম জপ চালাইয়া যায়, তাহার ধ্যান আপনি জমিয়া যায়। ধ্যান ছাড়া জপ হয় না। অর্থাৎ জপের সঙ্গে সঙ্গে এক এক বার

করিয়া ইষ্টস্মরণ হয়ই হয়। অবিচ্ছেদ ইষ্টস্মরণেরই নাম ধ্যান। অতএব জপে আর ধ্যানে পার্থক্য মাত্র মাত্রার, গুণের নহে। যে শব্দটীই উচ্চারণ কর, তাহা মুখেই কর আর মনেই কর, তাহার ভিতরে একটী অন্তর্নিহিত ভাব আছে। সেই ভাবটী স্মরণের নাম ধ্যান। একবার জপে ক্ষণিকের ধ্যান হয়। অবিচ্ছেদ্য জপে অবিচ্ছেদ্য ধ্যান হয়। অবিচ্ছেদ্য জপে অবিচ্ছেদ্য ধ্যান হয়। মন্ত্রার্থস্মরণ না করিয়া মন্ত্রজপ একটা যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র, তাহাতে মনের ত্রাণ হয় না। এজন্য মন্ত্রার্থ-স্মরণকেই মন্ত্রে প্রাণ-সঞ্চার বলা হইয়া থাকে। মন্ত্রার্থ-স্মরণ আর মন্ত্রের জাগরণ একই কথা।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

বারাণসী

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তোমাদিগকে চারিবার উপাসনা করিতে বলিয়াছি,—প্রাতে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ও শয়ন-কালে। সংক্ষিপ্ত আকারে করিলেও সকল ব্যক্তিই এই চারিবারের উপাসনা নিয়মিত করিয়া যাইতে পারে। যেমন, মুসলমানদের নমাজ। ন্যূনতম রুকু কয়টী পাঠ করিয়া নমাজ শেষ করিতে হইলে কোনও মুসলমানের পক্ষেই দৈনিক

পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়া কঠিন নহে। কিন্তু ধ্যান জমাইয়া বা বহুক্ষণ ধরিয়া তসবী জপিয়া নমাজ পড়িতে হইলে পাঁচ ওক্ত রক্ষা করিবার পরে অন্য দশটী সাংসারিক কাজের অবসর কমিয়া যায়। কিন্তু ছোট করিয়া হউক বা বড় করিয়া হউক, প্রত্যেক মুসলমানকে পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়িতেই হইবে, এই বিধান বাধ্যকর হওয়াতে প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই এই কাজটীতে একান্তই বশংবদ। ফলে, ভিস্তিওয়ালা, কসাই, জোল্হা, মজদুর, খানশামা, বাবুর্চ্চি, পাইক, পেয়াদা, চাষী, শিক্ষক, মৌলবী বা আমীর জীবিকায় ও জীবনে যে যাহাই হউক না কেন, নমাজ পড়িবার সময়টুকু প্রত্যেকেরই হয়। কিন্তু হিন্দুদের উপাসনায় ন্যূনতম ক্রমটুকু নির্দ্ধারিত নাই। ভাবালুতার আধিক্য বশতঃ সংক্ষিপ্ত উপাসনা-গুলিও অতীব দীর্ঘায়ত এবং বহুসময়সাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, যে সাধন-ভাজন করে, সে সারাদিনই উহাতে লাগিয়া থাকে আর যাহার তাহা সাধ্য নহে, সে ঐ আপদের ধার-কাছ দিয়াও যায় না। এই জন্যই হিন্দুনামধারীদের মধ্যে বচনবাগীশ তত্ত্বালোচকের সংখ্যা অত্যধিক, করিৎকর্ম্ম ও ক্রিয়ান্বিত সাধকের সংখ্যা অতীব অল্প; সমগ্র দিবারাত্র যে কদাচ একবারও ঈশ্বরারাধনায় বসে না, তাহার মুখে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, সাকারতত্ত্ব নিরাকারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে অতীব হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ দার্শনিক সন্দর্ভের খৈ ছুটিতে থাকে।

তোমাদিগকে এই বাহুল্য-বিলাস পরিহার করিতে হইবে। ভোর বেলা আর শয়নকালে উপাসনাকে যতটা দীর্ঘায়ত করিতে চাহ, কর। অন্য দুইটী সময়ে সংক্ষিপ্ত করিলে দোষ কি? উপাসনা প্রাণের আহার। সঙ্গতি থাকিলে আমরা দেহের আহারও কি দৈনিক চারিবার গ্রহণ করি না? দুইবার পেট ভরিয়া খাই, দুইবার সংক্ষেপে জলযোগ সারি। অবশ্য, আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী গেলে বা ছুটি-ছাটার দিনে চারিবারই যে ভরপেট খাওয়া হয় না, তাহা নহে। উপাসনা সম্পর্কেও তাহাই জানিবে। কাজের লোকেরা সংসারের সহস্র কাজের ধান্ধায় পড়িয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়। এজন্য সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎকাল আগ হইতেই ঈশ্বরের আরাধনাটুকু সুর করা ভাল। তাহাতে আরাধনার জন্য একটু বেশী সময় পাওয়া যায়। আর, শয়নকালে নিদ্রাগত না হওয়া পর্য্যন্ত উপাসনা একটু বেশী সময় নিয়া করা যাইতে পারে। তবে, এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরটীর সহায়তায়ই যখন পরমেশ্বরকে ভজনা করিতে হইবে, তখন অতিরিক্ত রাত্রি-জাগরণ সঙ্গত নহে।

রাত্রের জপ বিছানায় বসিয়াই করিবে। জপ করিতে করিতে আলস্য আসিয়া গেলে শয্যাশ্রয় লইয়াই জপ চালাইতে থাকিবে। জপ করিতে করিতে নিদ্রা আসিয়া গেলে তাহার পরে কি হইল না হইল, তাহা নিয়া আর দুশ্চিন্তা করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

বারাণসী

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নাম করিতে থাক। নাম করিতে করিতে কাম কমিবে। যেখানে নামে নিষ্ঠা আছে, কাম সেখানে দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারে না। একদিন দিবারাত্রি জপ আর একদিন একবারও নহে, নামজপের ফলদায়ী রীতি ইহা নহে। অল্প অল্পই জপ কর কিন্তু নিয়মিত কর, নিত্য কর, একই সময়ে কর। আজ পাঁচটায়, কাল দশটায় নহে। এভাবে অভ্যাস করিতে করিতে নামে অরুচি নষ্ট হইবে। তখন নামের সময়ের দৈর্ঘ্য আস্তে আস্তে আপনি বাড়িবে বা নিজে চেষ্টা করিয়া বাড়াইয়া নিবে।

অসুস্থ অবস্থায় শুইয়াই নাম করিও। শ্বাসক্লেশ থাকিলে ছোট্ট একটী মেরুহীন মালা লইয়া অবিশ্রান্ত জপ চালাইবে। জপকালে কেবল ইষ্টস্মরণ করিতে চেষ্টা করিবে। অন্য চিন্তা অতি প্রবল ভাবে আসিতে থাকিলে মনে মনে জপ না করিয়া নিজের শ্রুতি-গোচর করিয়া জপ চালাইবে অথবা ইষ্টনামের স্মারক কীর্ত্তন গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিবে।

শায়িত অবস্থায় কুচিন্তা জাগিলে তাহা সহজে মানুষকে ছাড়িতে চাহে না। তাই, রুগ্ন শরীরে বসিবার ক্ষমতা থাকিলে

কুচিন্তা আসা মাত্র শায়িতাবস্থা হইতে উঠিয়া কিছুকাল উপবেশিতাবস্থায় থাকা ভাল। শারীরিক শ্রম কুচিন্তার যম। সুস্থ শরীরে কুচিন্তা আসিলে শায়িত ব্যক্তি সহজেই গাত্রোত্থান করিয়া কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া বা দ্রুত ধাবনের সাহায্যে কুচিন্তা দমন করিতে পারে, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা কুচিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু রুগ্নাবস্থায় শয্যাশায়ী ব্যক্তি তাহা পারে না। তাহার পক্ষে উপাংশুজপ অর্থাৎ নিজের শ্রুতিগোচর করিয়া মালাজপ প্রশস্য।

তুমি আমার সহায়তা চাহিয়াছ। আমার সহায়তা সর্ব্বদাই পাইবে। নিজের যতটুকু শক্তি আছে, তাহা প্রয়োগ কর, দেখিবে, আমিও আমার শক্তিকে তোমার জন্য নিয়োগ করিয়াছি। আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে আছি, তোমার বন্ধু রূপে, সহায়ক রূপে সর্ব্বোতোভাবে তোমাকে সাহায্য করিতেছি। লক্ষ্য করিলেই প্রতিপদে ইহা টের পাইবে। ইহা বিজ্ঞাপনীয় বিষয় নহে।

দীক্ষাকালে কোনও কোনও শিষ্য সত্য সত্যই গুরুর সাধন-শক্তির পরিচয় পায়। কেহ কেহ কিছুই টের পায় না। যে পায়, সে ভাগ্যবান্। যে না পায়, সে দুর্ভাগা নহে। শুধু এই পার্থক্যের দ্বারা শিষ্যের উৎকৃষ্টত্ব বা নিকৃষ্টত্ব বুঝা যায় না। ঐকান্তিক আগ্রহ ও দ্বিধাহীন আনুগত্য নিয়া গুরুদত্ত সাধন যে করে, সে-ই প্রকৃত শিষ্য। সাধন করিতে করিতে লব্ধ পন্থার প্রতি গভীর নিষ্ঠা আসে। এই নিষ্ঠা আসিলেই গুরুর শক্তি শিষ্যের

মধ্যে প্রকাশ পায়। তখন শিষ্য অতি সহজে প্রকৃতি জয় করে। দীক্ষা গ্রহণকালেই গুরুর শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, তবু শিষ্য সাধন করিল না, ইহা দুঃখকর।

বিলাস-লালসা, ভোগ-কামনা, জড়ীয় সুখবিলাসলৌল্য তোমাকে নিরন্তর টানিতেছে বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। তোমার দেহ একটা জড় মাংসপিণ্ড, একটা রস-রক্ত-মেদ-মজ্জার সমষ্টি মাত্র। দেহেতে দেহের ধর্ম্ম রহিয়াছে বলিয়া ক্ষোভ করা নিরর্থক। নাম করিতে করিতে তুমি দেহধারী হইয়াও নিজেকে দেহাতীত বলিয়া অনুভব করিবে। তখন কাম তোমার কিঙ্কর হইবে। কামকে বিনাশ করাই চরম কথা নহে। কামেরও জগতে প্রয়োজন আছে। তোমাকে কামের প্রভু হইতে হইবে। নামের সেবা তোমাকে তাহাই করিবে।

অনেক মহাপুরুষেরা ইতরসুখাকৃষ্ট শিষ্যকে নিজেদের ঐশী শক্তির মহিমায় বিপথ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন, ইহা সত্য। কিন্তু যে সকল স্থলে শিষ্যগণ নিজেদের পুরুষকারকে চূড়ান্ত ভাবে প্রয়োগ করিয়া নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়াছেন, সেই সকল স্থলে তাঁহারা নিজ নিজ গুরুদেবকে শিষ্য- গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। গুরু চিরকালই শিষ্যকে শক্তি দান করিবেন কিন্তু শিষ্যই বা কেন গুরুদেবকে গৌরবদানে কৃপণ রহিবেন?

শিষ্য যদৃচ্ছা পাপ করিয়া বেড়াইবে এবং গুরুদেব নিরন্তর তাহাকে নিজ তপঃপ্রতাপে কেবলই রক্ষা করিয়া যাইবেন, গুরুদেবের উপরে ইহা তোমার এক অতীব অন্যায় আবদার। দেশের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাযুক্ত অনেক ব্যক্তিরও দেখিয়াছি, তাঁহারা সুশাসনের প্রতিষ্ঠা চান, কুশাসনের অবসান চান, দ্রব্যমূল্যের হ্রাস চান, স্বল্পব্যয়ে পুত্রকন্যার বিদ্যার্জ্জন চান, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ চান, দীর্ঘায়ুর আনুকূল্য চান কিন্তু তাহার জন্য নিজেরা গায়ে পায়ে বা হাতে কলমে কিছু করিতে চাহেন না। সকল সমস্যার সমাধান তাঁহারা চাহেন রাষ্ট্রক্ষমতাধিকারী রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে অথবা সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে। নিজেরাই ভোট দিয়া যখন অতি সাধারণ লোকগুলিকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রকর্ণধার করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিকটে এই প্রত্যাশা কোনও অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার নহে। কিন্তু এই প্রত্যাশা শুধু তাঁহাদের নিকট করিলেই চলিবে না, যাঁহারা জনসাধারণের ভোট-নিয়োজিত দাস মাত্র; এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য নিজেদেরও অনেক কিছু করিতে হইবে। সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে এই সকল সমস্যার সমাধান চাহিতে যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত অস্বাভাবিক। সাধু-সজ্জনেরা যোগবলে মানুষের সকল পার্থিব দুঃখ দূর করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশ্যে আচার্য্যেরা যোগের বা ভক্তির বা তত্ত্বজ্ঞানের আবিষ্কার করেন নাই।

সাংসারিক ব্যাপারেও যেইরূপ, পারমার্থিক ব্যাপারেও সেইরূপ জানিও। তোমাকে নিজের বলেই নিজের অন্ধত্ব দূর করিতে হইবে। তবে, তুমি যখন কায়মনোবাক্যে নিজের অপূর্ণতা দূর করিবার জন্য শ্রমরত হইবে, তখন তোমার প্রকৃত হিতৈষীরা ঐ তপোজগৎ হইতেই তোমাকে শক্তি-প্রবাহ প্রেরণ করিয়া জয়িষ্ণু হইবার সাহায্য করিবেন।—এই কথাটুকু মনে রাখিও।

নিজ বিবাহিতা পত্নীতে অসুখী বলিয়া যদি তুমি আত্মসুখ-কামনায় অন্য রমণীতে আসক্ত হও, তবে নিজ বিবাহিত পতিতে অসুখী বলিয়া আত্মসুখ-কামনায় তোমার পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হইলে তোমার বলিবার কি কিছু থাকে? যেখানে বিবাহের দ্বারা পতি অসুখী, সেখানে পত্নী কদাচ সুখী হইতে পারে না। ঐ অসুখী পত্নী এখনো তোমার প্রতি একান্ত ভাবে আসক্ত হইয়াই রহিয়াছে। তুমি কোন্ লজ্জায় অন্য দিকে তোমার আসক্তিকে ধাবিত করিতে পার?

কিন্তু অভ্যাসের কদর্য্য প্রভাবে তুমি ঐ লজ্জাজনক পরিস্থিতিকেই জীবনের নিত্যাচার রূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছিলে। জানো ইহা পাপ, তবু ইহা করিয়াছ। জানো ইহা অন্যায়, তবু ইহার প্রশ্রয় দিয়াছ। জানো ইহা চিত্ততাপবর্দ্ধক, অনুতাপক, জ্বালাময়, তবু ইহাতেই নিয়ত লাগিয়া রহিয়াছ। ইহা তোমার সাময়িক দুর্ব্বলতা মাত্র। ইহা তোমার চিরন্তন স্বভাব

নহে। এই ভাবে পাপাসক্ত হইবার পূর্ব্বে এই অবস্থাকে তুমি অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই জ্ঞান করিতে। নিরন্তর অভ্যাস করিতে করিতে সেই অবাঞ্ছনীয় জিনিষ তোমার নিকটে পরমবাঞ্ছার সামগ্রী হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত কথা।

অভ্যাসকে ফিরাও। চেষ্টা করিলেই তাহা পারিবে। শত জনে তাহা পারিয়াছে। পারিয়াছে নিজরই শক্তিতে, পারিয়াছে নামের শক্তিতে। নামে অনন্যশরণ হও। নামকে পরমাশ্রয় কর। অনাথ শিশু যেমন যাহাকে পায়, তাহার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদে, নামের বুকে তেমন করিয়া তুমি মাথা রাখো, তেমন করিয়া তুমি কাঁদো। কাঁদিতে কাঁদিতে চিত্ত নির্ম্মল হইবে, নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় মসৃণ হইবে, মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় সুন্দর হইবে, রাহুমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর হইবে, প্রাণ নিষ্কলুষ প্রেমে ভরপূর হইবে।

প্রেম নাই বলিয়াই কামের অত অহঙ্কার, অত তর্জ্জন-গর্জ্জন, অত দাপট। নামে পরমেশ্বরে প্রেম জাগিবে। সেই প্রেম তোমাকে রক্ষা করিবে।

রোগশয্যায় পড়িয়া কেবল হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিও না। যখন যতটুকু পার, নাম কর। তুমি ত' একটী চিরপ্রবহমান নদী। নাম তোমার প্রেমপারাবারের মোহনা মাত্র। প্রেম আসিলে তুমি আর নাম অভেদ হইবে, নামও ডুবিবে, তুমিও ডুবিবে, একমাত্র প্রেমই থাকিবে। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ বারাণসী

৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৭৩
(২৩-১১-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রের উত্তর লিখিয়া পুপুন্‌কী হইতে রওনা হইবার মুখে হঠাৎ এমন কিছু ঘটিল, যাহাতে তোমার পত্রের সহিত আরও খান দশেক পত্র বস্তাবন্দী হইয়া গেল এবং সম্ভবতঃ আমি পুনরায় পুপুন্‌কী ফিরিবার আগে সেই অন্ধকূপ হইতে তাহাদের মুক্তিলাভ ঘটিবে না। কিন্তু পুপুন্‌কী ফিরিতে দিন কতক দেরী হইবে।

চক্রধরপুর আমার মাথা খাইয়া ফেলিতেছে যে, চাইবাসা আমাকে যাইতেই হইবে এবং শনি ও রবিবার সেখানে পড়া চাই। জানি না, কেন ইহারা চাইবাসার জন্য এমন পাগল হইল। চক্রধরপুর নিজ স্থানে কোনও উল্লেখযোগ্য সংগঠন করিবে না, অথচ চাইবাসার তালিকার জন্য এযাবৎ পুপুন্‌কীতে পাঁচবার আসিয়া ধরাধরি করিয়া গিয়াছে। ইহারা জানে না, আমার নিকটে রবিবার কত বড় একটা দামী জিনিষ। আরও জানে না যে, বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে বৃথা ভ্রমণ আমার অনুচিত। বর্দ্ধমান, খড়্গপুর, মালদহ, বালুরঘাট, আলিপুর-দুয়ার, গৌহাটি, তিনসুকিয়া, শিলচর,

করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, আগরতলা বা খোয়াই একটা রবিবার পড়িলে সভাস্থলে শ্রোতার সংখ্যা হইবে পাঁচ হাজার। কিন্তু চাইবাসাতে কি হইবে, কে জানে? গেলেই কথা বলিতে হয়। কথা বলার মানেই হইতেছে আয়ুঃক্ষয়। আয়ুটাকে যত বেশী দামে বিকান যায়, ততই ভাল। তাই, অসংগঠিত স্থানে ভ্রমণ-তালিকা করিতে মন সায় দেয় না। শুধু একটা স্থানের জন্য ত' একটা প্রগ্রাম করা যায় না বাবা, যাইবার ও ফিরিবার পথে আরও দুই একটী স্থান না থাকিলে অনেক সময়ে গুরুতর অসুবিধাও হয়। আমরা ত' কোথাও গিয়া বক্তৃতা দিবার পরে চাঁদার খাতা লইয়া ঘরে ঘরে বর্গীর চৌথ আদায় করি না।

উপরে যাহা লিখিলাম, ঠিক সেই কারণেই তোমাদের ওখানে এখনো কোনও প্রগ্রাম করা সম্ভব হয় নাই। আমার আগ্রহ আছে কিন্তু তোমাদের প্রস্তুতি নাই। তোমরা ওখানে প্রায় পাঁচ বর্গমাইল স্থানের মধ্যে আমার সন্তানরূপে পরিচয় প্রদান করিয়া শতাধিক পুরুষ ও নারী আছ। তোমাদের এই কয় জনের মধ্যে ত্রিশ জনকে অপরিণতবয়স্ক, রুগ্ন, দুর্ব্বল, কর্ম্মে অক্ষম ও নিরাশ্রয় বলিয়া ধরিলাম। বাকী সত্তর জনের মধ্যে পঁয়ত্রিশ জন স্ত্রীলোক বিধায় ইহাদিগকেও বাদ দিলাম। অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে যোল জন মত্ত বিষয়াসক্ত এবং নামে মাত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া ধরিয়া লইলাম। যে পনের জন রহিল, তাহাদের মধ্যে দশজনও কি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আদর্শের

প্রচারে কিছু কিছু কার্য্যভার লইতে পারে না? কিন্তু তাহা তোমরা করিতেছ না। হঠাৎ একদিন আমি অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া আসিয়া তোমাদের ওখানে হাজির হইব এবং সাধ্যাতীত শ্রম করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিব, আর সঙ্গে সঙ্গে পত্রহীন পুষ্পহীন রস্-কস্-হীন জীর্ণ তরুগুলিতে নববসন্তের নবমঞ্জরী স্ফুরিত হইবে,—ইহা কি করিয়া প্রত্যাশা কর? সাধকের তপঃশক্তিতে ইহাও কখনো কখনো ঘটে কিন্তু ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম এবং বিরল ব্যাপার। তোমরা বিরলকেই স্বভাবিক এবং ব্যতিক্রমকেই নিয়ম করিয়া লইতে চাহ কেন? দেশব্যাপী নবজাগরণ যদি কদাচ ঘটে, তবে সেই সুমঙ্গল ঘটনার সবটুকু কৃতিত্ব ও দায়িত্ব তোমরা দৈবশক্তিশালী মহীয়ান্ পুরুষদের জন্যই ফেলিয়া রাখিতে চাহ কেন? এই ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেকরই যে কত করণীয় আছে, তাহা তোমরা ভুলিয়া যাও কেন? পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিজনকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়াছেন, তাহার সঙ্গত সমুচ্চয়ে যে অতি বৃহৎ বৃহৎ ইতিহাসের তোমরা উদ্ঘাটক হইতে পার, এই বিশ্বাস কেন তোমাদের মজ্জাগত হইতেছে না? এক বিন্দু জল অপর কোটি কোটি বিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া মহাসাগরের সৃষ্টি করিল। এক কণা বালুকা অপর কোটি কোটি বালুকণার সহিত মিলিত হইয়া সহস্র-যোজনব্যাপী বিরাট সৈকত-ভূমির সৃষ্টি করিল। একটী ক্ষুদ্র শ্যাওড়া গাছ, সোনালী গাছ, বিশ-কাঁটালী গাছ, ঢ্যামনা লতা, কুলকাঁটা আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ লতা-গুল্মের সহিত

মিলিত হইতে হইতে হঠাৎ একদিন লোক-ভয়ঙ্কর মহারণ্যের সৃষ্টি করিয়া বসিল। একের সহিত অপরে মিলিত হইলে কি যে হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বাষ্পীভূত জলবিন্দুগুলির আকাশ-সঞ্চরণ দেখিয়া কালবৈশাখীর অপরাহ্ণে অনুভব করিতে পারিবে।

দশটী মানুষ পৃথিবীতে তুচ্ছ নহে। কেন তোমরা দশটী করিয়া মানুষ এক এক স্থানে একত্র হইয়া নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র সামর্থ্য, ক্ষুদ্র মহানুভবতা, ক্ষুদ্র ত্যাগবুদ্ধি, ক্ষুদ্র শ্রমশীলতা ও ক্ষুদ্র যোগ্যতাকে একটা বিরাট রূপ দান করিবার চেষ্টা করিবে না? আমার কণ্ঠ শক্তিশালী, ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা যদি হয় আমার একারই কণ্ঠ, তবে তাহা কত দিক দিয়া কাজ করিবে, কত দিনে কতটুকু করিবে? আমার কণ্ঠ তোমাদের প্রতিজনের কণ্ঠে কেন ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, অনুধ্বনিত হইল না? আমার বাহু দুর্ব্বলের বাহু নহে, কিন্তু ইহা যদি হয় আমার একারই বাহু, তবে তাহা কত দিক দিয়া অরণ্য উৎখাত করিবে, কত দিন ধরিয়া অসুর-সংহার করিবে, কত দিক্ দিয়া জ্ঞানের মশাল ধরিবে, কত কাল ব্যাপিয়া ভক্তির ভাগীরথী কাটিয়া কাটিয়া শিবজটাজাল হইতে টানিয়া আনিয়া মর্ত্তজীবের কল্যাণ করিবে? তোমাদের বাহু কি বাহু নহে? সহস্র সহস্র দুর্ব্বল বাহুও যদি একত্র মিলিত হয়, পারে না কি তাহারা সগরবংশ উদ্ধার করিবার জন্য খাল কাটিয়া পুণ্যতোয়া গঙ্গার ধারাকে সমুদ্রে আনিয়া ফেলিতে, পারে না কি তাহারা পূর্ব্বাঞ্চলের হিমালয়-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রকে

আসাম উপত্যকার বুকের উপর দিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় টানিয়া আনিতে? চিরকালই কি তোমরা ভগীরথ আর পরশুরামের মতন ক্ষণজন্মা পুরুষদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় অলস হইয়া দিন কাটাইয়া যাইবে? পৌরুষহীনতার এই লজ্জাকর গ্লানি তোমাদের চরিত্র হইতে মুছিয়া যাওয়া যে আজ প্রয়োজন! হইলে এখনি তোমরা আমার বাহু হইতে পার কিন্তু হইতেছ কি?

পত্রের প্রত্যেকটী অক্ষর অর্থ বুঝিয়া পড় এবং তোমার প্রত্যেকটী ভাইবোনকে পড়িয়া শুনাও। নিজেরা পরামর্শে বসিয়া যাও যে, কি করিয়া তোমরা আমার বাহু হইতে পার। তারপরে লাগ কাজে। কাজ করিতে করিতে নিত্য নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া একদিকে আহরণ কর অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অন্য দিকে লাভ কর নিষ্কাম কর্ম্মের অনুশীলনজাত স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রসাদ। কে কি কাজ করিয়াছ, কে কতটুকু কি করিয়াছ, তাহার বিবরণ আমাকে জানিতে দাও। আমি জানিয়া সুখী হই যে, আমার কণ্ঠই তোমাদের কণ্ঠে কথা বলিতে সুরু করিয়াছে, আমার বাহুই তোমাদের বাহুতে কাজ করিতে সুরু করিয়াছে, আমার প্রাণই তোমাদের প্রতিটি প্রাণে স্পন্দন সুরু করিয়াছে। একান্তে বসিয়া আমি যে নিঃশ্বাসটী লই, তাহার সহিত তোমাদের নিঃশ্বাটী মিলুক। দূরান্তে বসিয়া আমি যে প্রশ্বাসটী ফেলি, তাহার সহিত তোমাদের প্রশ্বাসটী মিলুক। অবতার হইয়া মন্দিরের বিগ্রহ রূপে আমি পূজিত হইতে চাহি না, তোমাদের

প্রতি জনকে আমার সহিত অভেদ, একাত্ম, দ্বৈতরহিত করিয়া দিয়া আমি তোমাদের হাতে, পায়ে, চোখে, মুখে, মনে, প্রাণে অনন্তকাল-বিসর্পিণী মঙ্গলসাধনা করিয়া যাইতে চাহি।

অন্যান্য মঠের বা আশ্রমের প্রচারকেরা নিজেদের প্রচার-কার্য্য দারুণ ভাবে করিতেছেন বলিয়া উদ্বিগ্ন হইবার কিছু নাই। নিজেদের আদর্শ বিস্তারের কার্য্য করিবার অধিকার ইঁহাদের প্রত্যেকেরই আছে। তোমাদেরও আছে। তোমরা কাজ করিবে না, বসিয়া থাকিবে। ইঁহারা কাজই করিবেন, বসিয়া থাকিবেন না। এই পার্থক্যটুকু তোমরা দূর করিয়া দিয়া তোমরাও কাজে লাগ এবং বসিয়া থাকাকে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখ। অপরের শ্রীবৃদ্ধিতে যাহারা ঈর্ষ্যাকাতর হয়, তাহারা বড়ই নীচাত্মা। তোমরা নীচাত্মা আখ্যা লাভ না করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য কাজ নিজেদের হাতে লইয়া দারুণ কর্ম্মের অনপনীয় ফলে আত্মসম্বিৎকে উজ্জ্বল কর, সংজ্ঞাকে জাগ্রত কর। তোমরা থাকিবে ঘুমাইয়া আর অপরেরা করিবেন কাজ, এজন্য কাজের কাজীরা নিন্দনীয় হইবেন কেন? তোমরাও নিদ্রা-পরিহার কর। তোমরাও বজ্রমুষ্টিতে কর্ম্মের হাল ধর। তোমরাও অকুতোভয়ে কর্ম্মরণাঙ্গণে প্রবেশ কর। দুঃসাহস লইয়া অসাধ্য কর্ম্মেও হাত দাও এবং অসাধ্যকে সুসাধ্য করিবার জন্য প্রাণ দিয়া দাও। সৎকর্ম্মে প্রাণ দিতে পারিলেই প্রাণ পাইবে। মহদুদ্দেশ্যে যে মরে, সে-ই বাঁচিবার পথ উন্মুক্ত করে। সে একাই শুধু বাঁচে না, বাঁচে সে সকলকে লইয়া। সকলকে সে বাঁচিবার

অধিকার বিতরণ করে, মৃতকে সে জীবন্ত করে, মুমূর্ষুর প্রাণকে সে মূল্যবান্ করিয়া তোলে। দীক্ষা লইলেই কি হয় বাবা, তোমরা ত' অধিকাংশে এখনো শবদেহ মাত্র। তোমাদের প্রাণের স্পন্দন ত' অধিক স্থানে দেখিতেছি না। নিজেরা মড়ার মতন পড়িয়া থাকিবে আর অন্যেরা নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছেন দেখিয়া মনে জ্বালা বোধ করিবে, ইহা অতীব অন্যায় কথা। যাঁহারা যতটুকু সত্যানুসন্ধান করিতেছেন আর যাঁহারা যতটুকু মেহনত চালাইতেছেন, তাঁহারা ততটুকু ফলবান্ হইবেনই। বৈধ শ্রমের ন্যায্য ফল হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না। তোমরাও তোমাদের আদর্শ প্রচারের জন্য শ্রম কর, ফল পাইবেই। পরমেশ্বরকে আমি কৃপাময় বলিয়া জানি। কৃ—অর্থাৎ কর, পা—অর্থাৎ পাও। কাজ কর, ফল তার পাইবেই। তিনি কদাচ কাহাকেও নিজ কর্ম্মের ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

কর্ম্মের ফল হইতে তিনি কদাচ কাহাকেও বঞ্চিত করিবেন না বলিয়াই তোমাকে একটু সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হইবে। নিজ যশ চাহিও না। সমস্ত প্রশংসা দিবে পরমেশ্বরকে। নিজের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া মঙ্গলকর্ম্মে নামিও না। সকলের ভাল চাহিয়া কাজ করিবে। কলহ-বুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া করিবে কাজ। দ্বন্দ্ব-কলহ এড়াইয়া চলিতেই হইবে, কেন না, কলহের আবহাওয়া কর্ম্মের রুচি এবং শুচিতা এই দুইটাই নষ্ট করে। কাজ হইল কিনা, ইহা দেখিবে; তোমাকে নেতা করা হইয়াছে কিনা, এই

দিকে মোটেই নজর দিবে না। ছোটদের সম্মান দিবে,—অবজ্ঞা দিয়া ছোটদের কাছ হইতে কাজ আদায় করা যায় না। বড়দের তোষামোদ হইতে দূরে থাকিবে,—খোশামুদি করিয়া জগতে অনেক বড়কে অভিমানে স্ফীত করা হইয়াছে, যাহার ফলে তাহারা মহৎ কর্ম্মের সহায়ক না হইয়া বাধক হইয়াছে। সৎকর্ম্মীর কদাচ পদলেহনী বৃত্তি থাকা ভাল নয়। বড়দের খোশামুদি করিবে না বলিয়া আবার রুক্ষ বচনে, অশিষ্ট উক্তিতে, অভদ্র আচরণে, দর্পিত ব্যবহারে তাহাদিগকে মনঃক্ষুণ্ণ করিবার অধিকারও তোমার হয় না, ইহাও মনে রাখিও। তোমার লক্ষ্য হইবে কার্য্যের সুসমাপ্তি এবং কর্ম্মের পথে চলিবার কালে সর্ব্বতোভাবে সততা অবলম্বন।

চিন্তা করিয়া আগে বাহির কর, কাজের তোমাদের বাধাগুলি কি। পথ চলিবার আগে সৈন্যদল একদল অগ্রণীকে পাঠাইয়া দেয় পথে ঝোড়-জঙ্গল-কাঁটাগাছ কাটিয়া দূরে সরাইতে। পথ চলিতে সুরু করিবার আগে তোমরা বস্তা-বোঝাই বাবলা কাঁটা সেখানে নিক্ষেপ করিও না। বাধার সংখ্যা কমাইয়া তারপরে সুরু করিবে যাত্রা। কতকগুলি বাধা কিছুতেই দূর হয় না, সেগুলির মাথায় পদাঘাত করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। Line of least resistance বা স্বল্পতম বাধার পথ বাছিয়া নিবে কিন্তু একেবারে বাধাহীন কোনও পথ হয় না। সুতরাং যে বাধা আসিবে, তাহাকে জোর করিয়া জয় করিতে হইবে, আপোষ করিয়া নহে। পাপের সহিত আপোষ করিলে ক্রমে ক্রমে পাপের পঙ্কে ডুবিয়া মরিবারই আয়োজন করা হয়।

বলপূর্ব্বক একজনকেও তোমাদের পথে টানিবে না কিন্তু জগতের একজনকেও তোমাদের বাণী শুনাইতে বিরত রহিবে না। যে আদর্শে অন্য মতাবলম্বীর নিন্দা নাই, অন্যের প্রতি ঈর্ষ্যা নাই, অপরের অনিষ্টচিন্তা নাই, সেই আদর্শ জগতের প্রত্যেককে শুনাইবার সৎসাহস তোমাদের থাকা উচিত। শুনাইবার কতকিছু আছে কিন্তু এযাবৎ কাহাকেও কিছু শুনাও নাই, ইহাতে তোমাদের পরমায়ুর অপব্যবহার হইয়াছে। এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়াও মরিয়াই রহিয়াছিলে। এখন মরিয়া হইয়া বাঁচিয়া ওঠ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

বারাণসী

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার মন্ত্রশিষ্য নও, তাহাতে কি হইয়াছে? মন্ত্র না লইয়াও জীবনের জীবন, আপনার আপন হওয়া যায়। সেই পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্যই আমি নিয়ত আত্মবিলোপ করিয়া চলিয়াছি। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যদি আমার লোভ থাকিত, তাহা হইলে তোমাদের আপন হইতে পারিতাম না।

যাঁহারা শিষ্য নহেন, এমন অনেকে আমার নিকট পত্র লিখিয়া থাকেন। কিন্তু এত পত্র আসে যে, আমি পড়িয়া শেষ করিতে পারি না। এজন্যই কোনও কোনও পত্রের উত্তর একবৎসর পরেও দেওয়া হয়। শিষ্য বলিয়া কাহারও চিঠি-পত্রকে আমি একটু বেশী আদরের সামগ্রী বলিয়া মনে করি না। সমগ্র মানবজাতিই আমার আপন, আমি শুধু আমার শিষ্যদের জন্যই নহি। অনেক মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—তিনিই গতি, তিনিই গন্তব্য, তিনিই পথ, তিনিই লক্ষ্য। অনেক দেবপুরুষ বলিয়াছেন,—তাঁহার যে শরণ লইবে, সে-ই পরিত্রাণ পাইবে, তাঁহার ভক্তের বিনাশ নাই। আমি বলিয়াছি,—"যে আমারে চাহে নাই, আমি তারো হই।" আমি সকলের জন্য। যে আমাকে চিনে না, জানে না, মানে না, গণে না, এমন কি যে আমাকে অবজ্ঞা করে, অশ্রদ্ধা করে, বিদ্বেষ করে, যে আমাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে, আমি তাহারও জন্য। যে আমার জন্য দুগ্ধে মিশায় বিষ, সূচ্যগ্রে মিশায় কালকূট, লতাগুল্মের অন্তরালে বসিয়া হত্যার্থে ধনুকে আরোপণ করে তীর, ভিড়ের মাঝখানে শাণিত ছুরিকা লইয়া করে পশ্চাদ্ধাবন, আমি তাহারও জন্য। রাত্রিদিন আমার নিন্দা না করিলে যাহার রসনা-কণ্ডূয়ন কমে না, আমি তাহারও জন্য। আমাকে অপদস্থ, বিরক্ত ও অপমানিত করিয়া যাহার আনন্দ, আমি তাহারও জন্য। মানুষ মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করে কিন্তু নিন্দা বা অপমান সহিতে পারে না। তাই বধার্থীকেও ক্ষমা করিতে পারে, পারে না নিন্দুক আর অসম্মানকারীকে। আমি তাহাদিগকেও আপন জ্ঞান করি।

সুতরাং ইচ্ছা করিয়াই কাহারও পত্রের উত্তর দিতেছি না বা দিতে দেরী করিতেছি, এই ভ্রম কদাচ করিও না। সময় পাই না বলিয়াই তোমরা কেহ কেহ পত্রের উত্তর পাও না বা পাইলে বড় দেরীতে পাও। এজন্য কেহ মনে দুঃখ রাখিও না।

ভগবানের নাম অনুক্ষণ জপিয়া যাও। কর্ম্মে বা বিশ্রামে, নিদ্রায় বা জাগরণে, সুখে বা দুঃখে, সম্পদে বা বিপদে, ভয়ে বা অভয়ে, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তাঁর নামে মন লাগাইয়া রাখ। তুমি কোন্ নামে তাঁহাকে ডাকিয়াছ, ইহার বিচার তিনি করিবেন না। কারণ, জগতের সব নামই ঐ একই ভগবানের। তিনি দেখিবেন, তোমার মন নামে লাগিয়া আছে কি না। তিনি দেখিবেন, নাম করিবার কালে তাঁহার কথাই তোমার মনে পড়িতেছে কি না। নাম করিবে তাঁহার, আর মনে পড়িবে দিলবাহার কেশতৈল বা খোশবাহার শাড়ী, এরূপ হইলে চলিবে না। যে নামেই ডাক, সেই নামেই ভগবান খুশী, কেবল ডাকিবার সময়ে তাঁহার কথাটী মনে পড়া চাই।

আমার কাছে দীক্ষা নিলে আমি ওঙ্কার-মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রে দীক্ষা দেই না। আমার পরে যাঁহারা আমার স্থলাভিষিক্ত বা স্থলাভিষিক্তা হইবেন, তাঁহারাও এই এক মন্ত্রেই সকলকে দীক্ষা দিবেন। ইহার কারণ এই নহে যে, আমি অন্য মন্ত্রের বিদ্বেষী, পরন্তু প্রণব-মন্ত্রে সকল মন্ত্র বিরাজমান বলিয়াই অন্য মন্ত্রে দীক্ষা

দেওয়া আমি নিরর্থক মনে করি। কোনও কোনও আচার্য্য নিজ আরাধিত মন্ত্র ছাড়া অন্য দশ রকম মন্ত্রে দশ জনকে দীক্ষা দেন, ইহা দ্বারা বিভিন্ন রুচির ব্যক্তিদিগকে তাঁহারা শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিতে সমর্থ হন। এমনও শুনিয়াছি যে, একজন শিষ্য শক্তিমন্ত্র পাইবার পরে উহাতে অরুচিগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহাকে ঐ একই গুরু পুনরায় ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। ইহার ফলে শিষ্যের এক গুরু হইতে অন্য গুরুর আশ্রয়ে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নিবারিত হইল কিন্তু "গুরুবাক্য অব্যর্থ ও অপরিবর্ত্তনীয়" এই বিশ্বাসের মূলদেশে কুঠারাঘাত হইল। যুক্তি দেওয়া হইতে পারে যে, শিষ্যের মনোগতির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রুচি দেখিয়াই গুরুকে এইরূপ করিতে হয়, যেমন চিকিৎসক একই রোগীকে এখন কুইনিন, কদিন পরে ষ্ট্রিকনিন, আবার সময়ান্তরে পেনিসিলিন দিয়া থাকেন। কিন্তু দৃষ্টান্তটী যুক্তিসঙ্গত হইল না। শরীরের চিকিৎসক আর ভবরোগের চিকিৎসক পরস্পরের সহিত তুলনীয় নহেন। শরীরের রোগ-চিকিৎসায় ঔষধের নির্ণয় এক একটা বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া হইয়া থাকে, ভবরোগের চিকিৎসায় সর্ব্বরোগহর একটী মাত্র মহৌষধই প্রশস্ত। ভবরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মহাসমুদ্র-তরণেচ্ছু যাত্রীর সহিত তুলনা করা চলে। যে তরীতে সে উঠিয়াছে, বাঁচুক, মরুক, ডুবুক, ভাসুক, তাহাকে ঐ এক তরীই আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। তরণীতে ফুটা থাকিলে বিশ্বাস দিয়া সে জলসিঞ্চন করিবে, বাতাস প্রতিকূল হইলে সে বিশ্বাসের দাঁড় টানিবে, বাতাস অনুকূল

হইলে সে বিশ্বাসের পাল তুলিয়া দিবে, তরঙ্গগুলি বিশাল হইলে সে বিশ্বাসেই বুক বাঁধিবে, তুফান আসিলে সে বিশ্বাসের মাস্তুলটী প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিবে। নৌকা ডোবে ডুবুক, কিন্তু কদাচ সে মাস্তুল ছাড়িবে না। কোনও অবস্থাতেই সে নৌকা-বদল করিবার বুদ্ধি করিবে না। ইহাই ভবসমুদ্র পারের কৌশল। খ্রীষ্টান হউক, মুসলমান হউক, শাক্ত হউক, শৈব হউক, সাকারবাদী হউক, নিরাকারোপাসক হউক, মুক্তির পথ প্রত্যেকেরই ইহা। এই জন্যই ভবরোগের চিকিৎসককে কোনও ডাক্তার, কবিরাজ বা হাকিমের সহিত তুলনা করা চলে না।

উল্লিখিত কারণেই আমি ওঙ্কার-মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রে কাহাকেও দীক্ষা দেই না। শিষ্যত্ব-গ্রহণেচ্ছুর প্রতি ইহা আমার অবজ্ঞা নহে, আমার নিজ সাধন-লব্ধ উপলব্ধির প্রতি সীমাহীন বিশ্বাসের ইহা ফল। নানা মন্ত্রের সাধন করিয়া আমি চূড়ান্ত ফলস্বরূপ প্রণব-মন্ত্রকে পাইয়াছি। এজন্যই এই মন্ত্রের সহিত আমি নিজেকে একেবারে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আমি যখন কাহাকেও প্রণবমন্ত্রে দীক্ষা দেই, তখন আমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি যে, তাহার কর্ণকুহরে আমি নিজেকেই ঢালিয়া দিতেছি, তাহার দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা সব কিছুতে আমি অভিন্ন সত্তায় মিশিয়া যাইতেছি। আমার দীক্ষাদান প্রকৃত প্রস্তাবে আমার আত্মদান, ইহা শিষ্যলাভ নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ বারাণসী

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পিতৃবিয়োগে আমার সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাইতেছি।

ব্রাহ্মণের কেন একাদশাহে শ্রাদ্ধ আর শূদ্রের কেন ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ, এই প্রশ্ন করিয়াছ। মৃত্যুর পর সকলেই শোকাহত হয়। ব্রাহ্মণরা জ্ঞানী, অল্পদিনেই শোক দূর হয়। শূদ্রেরা অজ্ঞান, দীর্ঘকাল শোক থাকে। শ্রাদ্ধের ন্যায় অনুষ্ঠান অশোক অন্তরে করা উচিত। খুব সম্ভবতঃ এই সব কারণেই ব্রাহ্মণের এবং শূদ্রের শ্রাদ্ধকালের সময়ের ব্যবধান ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। অশৌচ-কালের দীর্ঘতারও ইহাই কারণ হইতে পারে। অথবা শৌচ-সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহাদির পবিত্রতা-সাধন স্বল্প-সময় সাপেক্ষ বিধায় অশৌচ-কাল সংক্ষিপ্ততর হইয়াছে। আজকাল এক মাস ধরিয়া অশৌচপালন অধিকাংশ শূদ্রসন্তানের কাম্য নহে বলিয়াই অখণ্ডমতে একাদশাহে ইঁহারা করিতে চাহেন, তোমার এই ধারণা ঠিক নহে। অখণ্ডমতের শুদ্ধতাই অনেক চিন্তাশীল মানব-মানবীকে অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উৎসাহিত করিতেছে। অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহ মন্ত্রতন্ত্রের জটিল-গ্রন্থি-মুক্ত এবং আর্থিক দিক দিয়াও তাহা স্বল্প-ব্যয়-সাপেক্ষ।

পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিয়াছেন স্মৃতি শাস্ত্র। কিন্তু জ্যেষ্ঠ-কণিষ্ঠ-নির্ব্বিশেষে সকল পুত্রই যদি শ্রাদ্ধ করেন, তবে তাহাতে প্রত্যবায় হয় বলিয়া আমার মনে হয় না।

পুত্র পিণ্ড না দিলে পিতামাতার আত্মিক শান্তি হয় না, ইহা দেশ-প্রচলিত বদ্ধমূল সংস্কার। কিন্তু যাঁহার পুত্র নাই, তাঁহার উদ্দেশ্যে যে-কেহ পিণ্ডদান করিতে পারেন, ইহাও বিধি রহিয়াছে। পিণ্ড বস্তুটা কিছুই নহে। বস্তু হিসাবে তাহার কোনও মূল্য নাই। কিন্তু পিণ্ডদাতার অন্তরের গভীরে পিতৃ-মাতৃ-আত্মার শান্তি-সঞ্জননের যে আকূতি রহিয়াছে, উহাই আসল কথা। প্রথা হিসাবে পিণ্ডদানকে কেহ হয়ত অপ্রচলিত যুগের একটা অনাবশ্যক ভগ্নাংশ বলিয়া মন্তব্য করিতে পারেন কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে অনুভবটুকু রহিয়াছে, তাহা অনবদ্য।

তুমি অপুত্রক বলিয়া, তোমার একথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই যে, মৃত্যুর পরে তোমার আত্মার শান্তি হইবে না। ভীষ্মের পুত্র ছিল না। তাঁহার আত্মা অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিয়া রহিয়াছে। এই আত্মার শান্তিভঙ্গ করিবে কে? ঈশ্বর-চিন্তনে নিজেকে আহুতি দিলে নিতান্ত অবনত আত্মারও উদ্ধার হইয়া যায়। নিয়ত ঈশ্বর-চিন্তন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ বারাণসী

২৮শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৭৩

(১২-৫-৬৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদ্য তারিখে আমার মেদিনীপুর জেলার বাঘাস্তি গ্রামে থাকিবার কল্পনা ছিল। অবশ্য সঠিক নিশ্চয়তা কিছু দিতে পারি নাই। ঠিক তারিখটা যথাকালে জানাইব বলিয়া স্থানে স্থানে পত্র দিয়াছিলাম। এই গ্রীষ্মেই সুবিধা হইলে মেদিনীপুর জেলার তিনটী বিভিন্ন অঞ্চলে আরও তিনটী গ্রামে যাইব বলিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু বিগত কতক দিবসের মধ্যে ঘটনার চক্র এমন ভাবে আবর্ত্তিত হইল যে, আমাকে পুপুন্‌কী আশ্রমে বাঁধা পড়িতে হইল। সেখানে আমাকে কর্ম্মহীনকে কর্ম্ম দিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করিতে হইবে। এজন্য অযাচক আশ্রম নিজেদের গাঁট হইতে দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে রাজি। অন্য দিক হইতে এই কাজে যদি আমার নিকট আরও অর্থ আসিয়া যায়, তবে তাহার একটী অবধি কপর্দ্দক এই কাজে ব্যয়িত হইবে। মোট কথা, তিনটী মাসের জন্য দুর্ভিক্ষ দমনের কাজে আটক পড়িয়া গেলাম। দূরে গিয়াছিলাম নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে। কিন্তু তাহা হইল না।

অতীতেও বিহারে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং দেশ স্বাধীন ছিল না বলিয়া সমস্ত দোষ আমরা ইংরাজের ঘাড়ে চাপাইয়াছি। সেই সময়েও আমাকে এই পুপুন্‌কীতে দুর্ভিক্ষ-দমনে কাজ করিতে হইয়াছে। সেই সময়েও আমি চাঁদার খাতা হাতে লইয়া জনসাধারণের দুয়ারে দুয়ারে ভিখারীর সাজে গিয়া হাজির হই নাই। আমি গ্রামে গ্রামে গিয়া মানুষকে নিয়া সভা-সমিতি করিয়াছি, বলিয়াছি, "যে পার, দশ বিশ পঁচিশ টাকার মাটি কাটাও, গরীবের হাতে কাজ দাও।" আর, গরীবদের নিয়া শোভাযাত্রা পরিচালন করিয়াছি, যাহার শ্লোগান ছিল,—

কর্ম্ম দাও, কর্ম্ম দাও,
ভিক্ষা চাই না, কর্ম্ম দাও।"

আজও সেই কাজই ধরিব, তবে শোভাযাত্রা আর শ্লোগান থাকিবে না।

চারিদিকে সরকারী তত্ত্বাবধানে নানা রকমের কর্ম্ম খোলা হইয়াছে। এখন একমাত্র বিবেচ্য, তত্ত্বাবধায়ক এবং পরিদর্শকেরা না মিছা হিসাব লিখিয়া গরীবের অন্ন লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। লোকের ধারণা, কংগেসী শাসনে এই একটী ব্যাপারই গুরুতর ভাবে ঘটিয়াছে। তাই ঘরপোড়া গরুরা সিন্দুরে মেঘকে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকের মন হইতে এই বিভ্রান্তি দূর করার দায়িত্ব আজ তাহাদের, যাহাদের হাতে আজ শাসন-দণ্ড। আমরা ইংরাজ-আমলেও সরকারী দাক্ষিণ্যের ধার ধারি নাই,

এই আমলেও তাহা করিব না। এজন্য আমাদের আর্থিক শক্তি সীমাবদ্ধ। কিন্তু একটী অবধি কাণাকড়িকে গরীবের টেঁকে নিয়া না পৌছান পর্য্যন্ত আমার শান্তি নাই।

লোককে ভিক্ষা দিয়া ক্ষুধার ক্লেশ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণীয় বটে কিন্তু এই পন্থাটী বড়ই অসাত্ত্বিক। ইংরাজের কাছ হইতে নিজশক্তি-বলে স্বাধীনতা কাড়িয়া আনিতে অক্ষম পুরুষেরা ভিক্ষার দান রূপে যখন স্বাধীনতা পাইলেন, তখন তার সঙ্গে যে দেশব্যাপী নৈতিক অধঃপতন সুরু হইল, তাহার গতি, ক্রম, বিস্তার ও বিবর্ত্তন লক্ষ্য কর। গত বিশ বছরে ভারতীয় জাতি দুই শতাব্দী কাল পিছনে হটিয়া গিয়াছে। চোরেরাই এ সময়ে বড় বাহাদুর, পরস্বাপহারীর জন্যই এই যুগে সব তারিফ, শয়তান ও জুয়াচোরের জন্যই কৌলীন্য আর প্রশংসা। বড় বড় ঠকেরা বড় বড় স্বনামধন্য কীর্ত্তিমান পুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী আমাদের ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষুকের কাছে নৈতিক সততা, চারিত্রিক উচ্চতা, বিবেকের আনুগত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ প্রত্যাশা করা অন্যায়। ভিক্ষায় স্বাধীনতা মিলিয়াছে, এই জন্যই ইহা এমন সর্ব্বনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

এই জন্যই দুর্ভিক্ষ দমনেও আমি ভিক্ষান্ন-দানের পক্ষপাতী নহি। নানা জনের কাছ হইতে ভিক্ষা দ্বারা অর্থ লাভ করিয়া তাহা ব্যয় করারও পক্ষপাতী নহি। এই জন্যই আমি অযাচক আশ্রমের স্বোপার্জ্জিত অর্থ দুর্ভিক্ষ-দমনে ব্যয়িত হইবে জানিয়া আহ্লাদিত

হইয়াছি। তোমরা জান যে, আমার সৃষ্ট অযাচক আশ্রম ভিক্ষা করে না কিন্তু জনসেবা করে। অযাচক আশ্রমের কর্ম্মীরা ভিক্ষার দ্বারা তনুরক্ষা করে না, নিজেরা নিজেদের অন্ন এবং তদতিরিক্ত জনসেবার জন্য অর্থ সৎপথে কায়িক শ্রম দ্বারা অর্জ্জন করে। নিজ ব্যয়ে, নিজ শ্রমে অযাচক আশ্রম সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনির্ভর-পরায়ণ ও স্বোদর-প্রতিপালনে সমর্থ করিয়া দিয়া আমি ইহাকে যোগ্যদের হস্তে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। অযাচক আশ্রম হইতে এক কণা তণ্ডুলও আমি আমার নিজ ক্ষুন্নিবারণের জন্য গ্রহণ করি না।

এবার কিছুদিন আমি অযাচক আশ্রমের দুর্ভিক্ষ-কালীন জন-সেবাকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিব। সুতরাং ব্যস্ত থাকিব। পত্র না পাইলে বিরক্ত হইও না। পত্র ত' অনেককে লিখবই কিন্তু প্রত্যেককে পত্রলেখা কি সম্ভব? একজনের নিকট লিখিত পত্র হইতেই বা দশজনে কেন উপদেশ ও পথনির্দ্দেশ আহরণ করিবে না? আর, পত্র পাওয়াই কি বড় কথা? তোমাদের বাঞ্ছিত স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিতে আমি না যাইতে পারিলে তোমরা ব্যথিত হইও না। আমাকে নিরুদ্বেগ চিত্তে আমার প্রিয় কাজগুলি করিতে দাও। তাহাতে গৌণ ভাবে তোমাদেরও উপকার হইবে।

শারীরটা সারিয়া উঠিয়াছিল, আবার ক্লিষ্ট বোধ করিতেছি। সাধনার গুরুতর পীড়া আমাকে নয়াদিল্লী হইতে বারাণসী টানিয়া আনিল। সাধনাও কলিকাতায় প্রায় অচিকিৎসিত অবস্থায়ই আছে।

সেও তার কর্ত্তব্য কাজ লইয়া ব্যস্ত। পত্র লিখিবার কাহার কোথায় অফুরন্ত অবসর? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৭৪
(২২-৫-৬৭ ইং)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুপুন্‌কী পৌছিয়াই তোমার রেজেষ্টারী করা পত্রখানা পাইলাম। অকারণে কেন মা ডাক-খরচা বাড়াও? রেজেষ্টারী, আন্‌রেজেষ্টারী, এক্‌সপ্রেস ও সাধারণ সব পত্রই আমি সমান মন দিয়া পড়ি এবং সাধ্যমত জবাব দেই। যখন যাহা লিখিবার, সাধারণ ডাকেই লিখিও।

সময় পাইলে জবাব দেওয়া আমার স্বভাব।

এখন পুপুন্‌কীতে বিরাট শ্রমিকদল মাটি কাটা সুরু করিয়াছে। তাহাদের কাজ দেখা একটী দুইটী লোকের সাধ্য নহে। আর, আমি যখন কাজ দেখি, তখন এই মাটিতে বহুবর্ষ পরে ভবিষ্যৎ কর্ম্মীরা কি কি করিবেন না-করিবেন, তাহা ভাবি। ফলে, আমার চোখের শ্রমের অপেক্ষা মস্তিষ্কের শ্রম বেশী হয়। নতুবা প্রাণান্তকর

রৌদ্রে বসিয়াও লেখনী লইয়া তোমাদের পত্রের জবাব দিতে চেষ্টা করিতাম।

তোমার পত্রে তোমার মাতৃদেবীর অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধের বিষয় জানিলাম। তোমরা যে নানা জটিলতা হইতে মুক্ত অতি সহজ প্রণালীর শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান চারিদিকে সুরু করিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমি পরমেশ্বরের লীলা ভাবিয়া বিমুগ্ধ হইতেছি। আমি তোমাদের কাহাকেও কখনও বলি নাই যে, প্রচলিত মতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহ করিও না, বলি নাই যে, প্রত্যেককে অখণ্ড-মতেই এসব করিতে হইবে। তবু তোমরা অনেকে নিজেদের অন্তরের আগ্রহ অনুসরণ করিয়া সমবেত উপাসনার দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ভয়ে করিয়া যাইতেছ, যাহা শুধুই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান নহে, যাহা সামাজিক অনুষ্ঠানও বটে। সামাজিক অনুষ্ঠানে কেহ সমাজ-প্রচলিত বিধির এদিক সেদিক করিলে সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতিদের বা শাস্ত্রানুসারী পণ্ডিতবর্গের রক্ত-চক্ষুর শাসন সুরু হইয়া যায় এবং ইঁহারা সমাজে বহু সঙ্গত কারণেই মান্য ব্যক্তি বলিয়া ইঁহাদের রক্ত-চক্ষুকে সকলেই ভয় করে। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, তোমাদের অনেকের ভিতরে প্রাচীন প্রথায় জটিলতা হইতে মুক্ত হইয়া সহজ সরল ভাবে কার্য্যানুষ্ঠান সমাপ্ত করার যে আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার প্রতি চারিদিক হইতে শত শত অপক্ষপাত-কণ্ঠে প্রশংসা-বাণী উচ্চারিত হইতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, পরমেশ্বর তোমাদের কার্য্য অনুমোদন

করিতেছেন। প্রচলিত প্রথার অনুসরণকারীদের প্রতি বিদ্বেষ, বিরক্তি বা নিন্দনীয় ভাব পোষণ না করিয়াই যে তোমরা নিজ নিজ কাজ অন্তরের পরিপূর্ণ উপলব্ধি অনুযায়ী করিয়া যাইতে পারিতেছ, এজন্য তোমরা সকলে আমার অশেষ আশীর্ব্বাদের আস্পদ হইলে। নদীতে যখন প্লাবন আসে, তখন পাড় ভাঙ্গিয়া ফেলাই তাহার লক্ষ্য নহে। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য জলের বেগকে মহাসমুদ্রের বুকে নিয়া ফেলা। ইহার ফলে কোথাও এক পাড়, কোথাও দুইটী পাড়ই ভাঙ্গিতে পারে কিন্তু পাড় ভাঙ্গা তাহার উদ্দেশ্যও নহে, কৃতিত্বও নহে। হিমালয়ের বুকে মেঘ জমিলে তাহা জল হইয়া নদী বাহিয়া নীচে নামিবেই। সমুদ্রই তাহার গতি, সমুদ্রই তাহার গন্তব্য। সমুদ্রকে ছাড়া অন্য কাহারও ভাবনা সে ভাবে না। জলের যত আধিক্য, বেগের তত প্রাবল্য। কিন্তু কাম্য তাহার হইতেছে একমাত্র সমুদ্রে গমন।

সমাজ-বিপ্লবকে আমি এই দৃষ্টিতে দেখি এবং বিপ্লব সৃষ্টি করিবার জন্য কোনও কৃত্রিম চেষ্টার আশ্রয় লওয়া আমি নিতান্তই নিরর্থক জ্ঞান করি। তোমাদের ভাবের ঘরে কড়ি জমুক, তবে না তোমরা করিবার মত কাজ কিছু করিতে পারিবে! অন্তরের ধনাঢ্যতায় তোমরা অতুলনীয় হও। বাকী সব আপনা আপনি হইয়া যাইবে।

তোমার পত্রের শেষাংশ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে মা।

নিজেকে একান্তই নিরাশ্রয় জানিয়া পরমাশ্রয় ভগবানের তুমি শরণাপন্ন হইতেছ। নিজেকে একান্ত নিরাশ্রয় না ভাবিতে পারিলে ঐ পরমাশ্রয়ে রুচি, রতি ও নিষ্ঠা আসে না। নিজের অন্তরকে যে যত রিক্ত করিতে পারিয়াছে, তাহার আত্মসমর্পণ তত অকপট হয়। ফোঁটা-তিলকে ধর্ম্ম নাই মা, তবে উহারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও কোনও পাত্রে ধর্ম্মে রতি ও রুচি বাড়ায়, ইহা সত্য। এই জন্যই মালা, ঝোলা, ফোঁটা, তিলক আদিকে এক কথায় নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার প্রবৃত্তি ভাল নহে। কিন্তু ভগবানে অকপট আত্মসমর্পণই ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি। দানে নহে, যজ্ঞে নহে, তীর্থে নহে, অরণ্যে নহে, তপস্যায় নহে, মহোৎসবে নহে, নর্ত্তনে নহে, কুর্দ্দনে নহে, অশ্রু-কম্প-স্বেদ-পুলকাদিতে নহে, সরল মনের অকপট আত্মসমর্পণেই সকল কিছুর আসল সার্থকতা। আত্ম-সমর্পণের মহিমা যখন একবার হইলেও বা একটুকু হইলেও বুঝিয়াছ, তখন আর এমন সুন্দর, এমন মধুর, একন স্নিগ্ধ, এমন শীতল রাস্তাটুকু ছাড়িয়া আর পথ চলিও না। পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিলে জগতে অন্যের মুখাপেক্ষা কমিয়া যায়, ফলে মানুষ প্রকৃত স্বাধীন এবং প্রকৃত সুখী হয়। অন্যাপেক্ষাই পরাধীনতা, পরাধীনতাই দুঃখ। দুঃখ অবাঞ্ছনীয়। কেন? না, ইহা প্রেমঘ্ন ও চিত্তবিক্ষেপকর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। কিরূপ অবস্থায় তোমরা হোজাই গিয়াছিলে এবং দীক্ষা পাইয়াছিলে, স্মরণ করিলে রোমাঞ্চ হয়। তোমাদের প্রাণের আগ্রহ অকপট ও অকৃত্রিম বলিয়াই তোমাদের একজনেও নাগাদের টাইম-বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারাও নাই।

দীক্ষা নিয়াছ, কাজ এখানেই শেষ হইল না। সাধন করিতে হইবে। সাধন করিবে একা তোমার মুক্তির জন্য নহে, বিশ্বের সকলের মুক্তির জন্য। তোমার সাধনায় স্বার্থপরতার স্থান নাই। তোমার সাধন জগন্মঙ্গলের সাধন।

তোমরা কুমারী। কুমারী মেয়েদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহাদের কৌমার্য্যের উপরে যেন কোনও পাষণ্ড কদাচ আঘাত না হানিতে পারে। এই বয়সে সদা-সতর্কতা প্রয়োজন। বড় বড় নেতাদের জীবনে চরিত্র-স্খলন দেখিয়া এবং চরিত্রচ্যুতি সত্ত্বেও লোকের নিকটে তাহাদের অসম্ভব সমাদর দেখিয়া নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডারা পর্য্যন্ত আজকাল মনে করিয়া থাকে যে, দুঃসাহস করিয়া যাহা-কিছু একটা করিয়া ফেলিলে তাহাদের শাসন করিবে কে?

সত্যই, ইহাদিগকে শাসন করিবার লোক যে আজকাল দেখা যায় না, ইহাই ইহাদের অপরিণামদর্শী আচরণে ইন্ধন যোগাইতেছে। এমতাবস্থায় তোমাদিগকেই সদাসতর্ক এবং খড়্গহস্ত হইতে হইবে।

সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিবার কালে ভাবিতে থাকিবে, এ নাম সর্ব্ববীর্য্যের, সর্ব্বশক্তির, সর্ব্বশৌর্য্যের মূলাধার শ্রীভগবানের নাম; অতএব এই নামে বীর্য্য বাড়ে, শক্তি বাড়ে, শৌর্য বাড়ে। ধার্ম্মিক হইলেই কাপুরুষ হইতে হয়, এই মিথ্যা ধারণাকে মন হইতে সবলে দূর করিয়া দাও।

পত্রখানা তোমার প্রত্যেকটী কুমারী ভগিনীকে দেখিতে দিও। প্রত্যেকে তোমরা কোমলা ও প্রেমশীলা হও। কিন্তু সেই কোমলতা সত্য এবং ধর্ম্ম সম্পর্কে, সেই প্রেমশীলতা পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনকারীদের সম্পর্কে। অন্যত্র তোমাদের রণচামুণ্ডার নৃশংস মূর্ত্তি ধারণের অধিকার আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৮ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৭৪
(২৩-৫-৬৭ ইং)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। দিনটা বড়ই পবিত্র। আজ তোমাদের ঐ অঞ্চলেই আমার থাকিবার প্রগ্রাম ছিল। তাহা কিছুটা প্রচারিতও হইয়া গিয়াচিল। কিন্তু পুপুন্‌কীর পরিস্থিতি আমাকে তাহা বাতিল করিতে বাধ্য করিল। এখানে নিরন্ন জনগণ গাইতি কোদাল লইয়া দুর্ভিক্ষের অন্ন অর্জ্জন করিতে আসিয়াছে, লোকগুলিকে কাজে লাগাইয়া না দিয়া অন্যত্র যাই কি করিয়া? তাই, বারাণসী হইতে পুপুন্‌কী ছুটিয়া আসিতে হইল। বর্ত্তমানে শতাধিক লোক কাজে লাগিয়াছে। প্রত্যহই লোক সংখ্যা বাড়িতেছে। কে কতটুকু কাজ করিল, ইহার দিকে আমার লক্ষ্য নাই, কে কতটুকু অন্ন পাইল, তাহার দিকেই আমার লক্ষ্য। ইতিমধ্যে দু-একটী পরিচিত গরীব লোকের অনাহারে বা দীর্ঘকালের অল্পাহারে প্রাণবিয়োগও ঘটিয়া গেল। অবস্থা মর্ম্মান্তিক। প্রাণে নিদারুণ লাগিতেছে। আজ সকাল বিকাল দুই বেলাই উপাসনা ছিল। সকালের উপাসনা মাটিকাটার টাঁড়ে গরীবদের কাজ দেখিয়া সারিব, সায়ংকালের উপাসনা করিব কলিকাতাগামী ট্রেণে বসিয়া।

তুমি যে বিষয় লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আর দ্বিমত হইতে পারে না আমার মতে কৌমার্য্য এক মহৎ গৌরব, এক মহতী শক্তি। এই সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য যেন ভারতের একটী মেয়েরও না হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কৌমার্য্যকে মহিমান্বিত দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই গার্হস্থ্য জীবনে সতীত্বের সমাদর হইয়াছিল। সতীত্বই রমণীর পরম সম্পদ হইয়াছিল বলিয়া এদেশে

জীবন্ত আদর্শের জন্ম হইয়াছিল। প্রাচীনের সেই তপস্যার সুফল হইতে আমরা নিজেদিগকে হেলায় বঞ্চিত করিতে পারি না। যাহাদের প্রদত্ত কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত বা কুপ্ররোচনা কৈশোর-জীবনের কৌমার্য্যকে আহত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে, তোমরা সমস্বরে সেই সকল জাতিবিধ্বংসী নেতার নেতৃত্ব অস্বীকার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ বারাণসী

রবিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৪

(৬-৮-৬৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদ্য কলিকাতা চলিলাম। সেখান হইতে দুই তিন দিনের মধ্যে পুপুন্‌কী ফিরিব। মাটি কাটার কাজের আর কিছুদিন তত্ত্বাবধান করিয়াই পুপুন্‌কী ছাড়িব। শরীর বড়ই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

শরীরমাদ্যং,—মানে, শরীর ভাল না থাকিলে ইচ্ছামত কাজ করা যায় না। বর্ত্তমানে দিনে চারি পাঁচ বার ঘুমাই আর বিশ্রামান্তে কাজ করি। কাজ করিতে ভাল লাগে, কারণ ইহা ভগবানের কাজ।

তোমরাও যে যেখানে যতটুকু পার, ভগবানের কাজ করিও। ভগবানের নাম অবিরাম স্মরণ করার চেয়ে বড় কাজ ও ভাল কাজ জগতে আর কিছুই নাই। অকপটে তাঁর নাম স্মরণ করিলে, আকুল প্রাণে তাঁকে ডাকিলে তিনি চিত্তশুদ্ধি দান করেন, সদ্‌বুদ্ধি দান করেন, সুরুচি সৃষ্টি করেন, অপকার্য্য হইতে ভক্তের দেহমনকে দূরে সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, পরিবেশ পবিত্র করেন। তুচ্ছতর স্বার্থের জন্য তোমরা কদাচ তাঁহাকে বিরক্ত করিও না। চিত্তশুদ্ধির জন্য অবিরাম ডাক।

পৃথিবীর সকল মানুষের যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর একমাত্র অন্নসমস্যা ব্যতীত অন্য সকল সমস্যাই মিটিয়া যাইতে পারে। অন্নসমস্যাটী মিটাইতে হইলে মানুষকে পরিশ্রমও করিতে হইবে। ক্ষুধা ভগবান্ জীবকে এই জন্যই দিয়াছেন যেন ইহারা অলস হইয়া না যায়। ক্ষুধা না থাকিলে জগতে কে কোন্ শ্রম করিত? ক্ষুধা না থাকিলে প্রত্যেকে আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া সারাদিন শুধু আকাশের নক্ষত্র বা জোনাকীপোকা গণিত। ক্ষুধাই মানুষকে অধীর করিয়া নিয়ত-কর্ম্মপরায়ণ রাখিতেছে। পৃথিবীতে যে সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদি বলিয়া কত কিছুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার মূল কারণ ক্ষুধা। এই ক্ষুধার অন্ন মানুষ নিজে অর্জ্জন করিয়া খাইবে, ইহাই ঈশ্বরাভিপ্রায়। এই জন্যই অন্নসত্র খুলিয়া দুর্ভিক্ষের মূল উৎপাটন করা যায় না। প্রতেকটী মানুষকে নিজ যোগ্যতানুযায়ী শ্রমে

নিয়োগ করিয়া তাহাদের দ্বারা পরিকল্পনানুসারী শ্রম করাইতে পারিলে এবং সেই শ্রম ধারাবাহিক ভাবে চলিলে দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ দিনে দূর হয়।

চিত্তশুদ্ধির জন্য ভগবানের নাম অবিরাম স্মরণ কর আর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক সর্ব্বশক্তি দিয়া শ্রমকর। শ্রম করিতে হইলেই নানা সময়ে নানা মানুষের সংস্পর্শে যাইতে হয়। যাহাতে তাহাদের প্রতিজনের প্রতি অন্তরের প্রেমভাব কিছুতেই না নষ্ট হইতে পারে, তাহার জন্য নিরন্তর ভগবানের নাম কর। নাম হইতে কেবল ভগবানেই প্রেম উপজে, তাহা নহে, সর্ব্বজীবে প্রেম আসে। নামের বীজে যে কল্পতরুর সৃষ্টি হয়, তাহাতে বিশ্বের সকলের জন্য প্রেমাম্র-ফল মিলে।

নামে গভীর বিশ্বাস রাখিবে। নাম করিতে করিতে নামে রুচি আসিবে এবং বিশ্বাস জাগিবে। বিশ্বাস আপনা আপনি আসিবে। বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য কোনও কৃত্রিম চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। নাম করিতে করিতে নামের প্রতি দরদ জাগিবে, এই দরদ বিশ্বাসের হাওয়া বহাইতে সুরু করিবে। বিশ্বাস আসিলে নামের সেবায় আনন্দ বাড়ে। সর্ত্ত করিয়া নাম করিও না। নিঃসর্ত্ত নামসেবা করিবে। নাম করিয়া তুমি কৃতার্থ হইতেছ, ভগবানের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতেছ না,—এই ভাবটী নিয়া নাম করিবে। তবেই নামে আসিবে আস্বাদন, আসিবে আনন্দ, আসিবে পরমা পরিতৃপ্তি এবং দূর হইবে সংসারের সহস্র পরিশ্রমের শ্রান্তি।

সংসার যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধ হইতে কাহারও রেহাই নাই। পূর্ব্বকর্ম্মফলে কাহারও কাহারও যুদ্ধে সহায়ক-সহায়িকা মিলে, কাহারও কাহারও পক্ষে একাকী অস্ত্র-শস্ত্র পরিচালনা ছাড়া আর গতি থাকে না। সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীভগবানকে নিজ সারথি জানিয়া নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে। যুদ্ধের সদ্যঃ ফল জয় বা পরাজয় যাহাই হউক, চূড়ান্ত ফল পরমেশ্বরে পরমা প্রীতি, ঈশ্বরানুগত্য ও ভগবানে সম্যক্ আত্মনিমজ্জন। আপাততঃ সংগ্রাম তোমার অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, তোমার শেষ প্রাপ্তি "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

একক সাধনে আর দলবদ্ধ ভাবে সাধনে পার্থক্য আছে। কিন্তু সময়-বিশেষে দুইটাই সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। দলবদ্ধ সাধনা হয় কীর্ত্তনে, ভজনে, সমবেত উপাসনায়। তখন সকলকে একই পরমেশ্বরের প্রিয়জন জানিয়া মনে মনে সম্মান করিতে হয়, অন্যের মান-সম্মানকে নিজের মান-সম্মানের চেয়ে দামী মনে করিতে হয় এবং কোনও অসতর্ক আচরণে কোনও ভক্তের অন্তরে অযথা ব্যথার সঞ্চার না ঘটে, তার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। কিন্তু একক সাধনে তুমি আর ভগবান মুখামুখি বসিয়া আছ. সমগ্র জগৎ তুমি তখন ভুলিয়া যাইবে এবং তাঁহাকেই একমাত্র সত্য ও শাশ্বত আশ্রয় জানিয়া অন্তরের কোমলতম কুসুমকলি অর্পণ করিবে। সমবেত সাধন ও একক সাধন, উভয়ই প্রয়োজনীয়, তবে তাহাদের প্রয়োজনের একটু রীতিভেদ আছে।

একক সাধনকারীরা সমবেত সাধনকারীদিগকে কদাচ কটাক্ষ করিবে না। সমবেত সাধনকারীরা একক সাধনকারীদিগকে কদাচ হেয় জ্ঞান করিবে না। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে একক সাধন ও সমবেত সাধন এই উভয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবে। একক সাধন-কালে তুমি যতটা স্বাধীন, সমবেত সাধন কালে ততটা নহ। অনেকের মিলনে যে সাধনানুষ্ঠান, তাহার জন্য পদ্ধতিবদ্ধ যে নিয়মপ্রণালী আছে, নিত্য নূতন প্রবর্ত্তনের নেশায় তাহার পরিবর্ত্তন তোমরা করিতে পার না।

একক বা সমবেত যে ভাবেই যখন উপাসনায় রত হও, তোমার লক্ষ্য যে বিশ্ব-মঙ্গল, ইহা কদাচ ভুলিও না। বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণুর কাছে তোমার ঋণ, সুতরাং বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণুর জন্য তোমার সাধনা। এখন তাহা এককই কর আর সমবেত ভাবেই কর।

উপাসনার আসরকে কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইতে দিও না। উপাসনার আসর বিতর্ক-সভা নহে। উপাসনা করিবে বিনীত মন, নম্র চিত্ত, কৃতজ্ঞ হৃদয় ও অনুগত চিন্তা লইয়া। অহমিকার ঔদ্ধত্য নিয়া উপাসনা-মণ্ডপে পাবেশ করিও না। অহঙ্কারকে পাদুকা রাখিবার স্থানে ফেলিয়া আসিও।

উপাসনা শক্তি-সংগ্রহের জন্য। শক্তিক্ষয়কারী কোনও চিন্তা, বাক্য বা আচরণকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও না।

কেহ কেহ হয়ত তোমার মতে সাধন করে না, করে অন্য

পন্থে। তাহাদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাভাব পোষণ করিও। যে যেভাবেই ভগবানকে ডাকুক, সে ভগবানের প্রিয় হইবারই ত' চেষ্টা করিতেছে! ভগবানের যে প্রিয়, সে তোমার অপ্রিয় কেন হইবে?

উপাসনা-কার্য্যে যাহারা বাধা দেয়, তাহারা তোমার ক্ষতি করে। কিন্তু তাঁহারা পিতা, পিতৃব্য, মাতা বা অন্য গুরুজন হইলে কি করিবে? উপাসনা ছাড়িতে পার না কিন্তু গুরুজনদের সম্মানও তোমার রাখিতে হইবে। ইঁহাদের প্রতি আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়াইবার দিকে তোমার প্রযত্ন চাই। ইঁহারা না বুঝিয়া তোমাকে বাধা দিতেছেন। কিন্তু তোমার ভক্তি-বিনয় অটুট থাকিলে আস্তে আস্তে ইঁহারা নিজ নিজ ভুল বুঝিবেন।

উপাসনা করিতে করিতে তোমার অনেক অতীত আচরণের জন্য তুমি মনে মনে অনুতপ্ত হইবে এবং লজ্জা বোধ করিবে। এই সময়ে একটু সঙ্কল্পের দৃঢ়তার প্রয়োজন হইবে। যাহা ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহা আর করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। ভগবানের নাম অবিরাম করিতে করিতে তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের শক্তিও আসিয়া যাইবে। ভগবানের নাম যে তোমার পরম আশ্রয়, একথা কদাচ ভুলিও না।

নাম এক মহাশাস্ত্র। এই একটীমাত্র বস্তু হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সকল শাস্ত্রের বিকাশ ও উদ্‌ঘাটন হইয়াছে। নামকে আদি-স্বরূপ জানিয়া প্রাণপণ বলে তাহা আঁকড়াইয়া থাক।

তোমার প্রত্যেকটী সৎ চেষ্টা ও সচ্চিন্তার সহিত আমি তোমার সঙ্গে সহায়ক রূপে আছি, একথাও মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

কলিকাতা

সোমবার, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৭৪

(৭-৮-৬৭ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আজ সকালে আচ্ছা বিপত্তিতে পড়িয়াছিলাম। ডুন-এক্‌স্‌প্রেস শেওড়াফুলি আসিয়া আর চলে না। ব্যাপার কি? না, রিষড়ার কাছে খাদ্যের দাবীতে জনসাধারণ দলে দলে সব গাড়ী আটক করিয়াছে। এরূপ নাকি রোজই চলিতেছে। ঠিক বুঝা গেল না যে গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকিলে খাদ্যটা আসিবে কি করিয়া? বাংলা সরকারের উপরে যদি চাপ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে বলিতে হয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে খাদ্য-সমস্যা মিটাইবার চেষ্টা আপ্রাণ করিতেছেন। বাধাটা আসিতেছে অন্য স্থান হইতে। দিল্লীর সরকারের উপরে যদি চাপ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয়, তবে রিষড়া অপেক্ষা দিল্লী যোগ্যতর স্থান। কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত-স্বভাব যুবক গাড়ীটায় উঠিল। এমন কাণ্ড আরম্ভ করিল

যে, আমরা ইহাদের উৎপাতে মালপত্র সহ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িব বলিয়া ভাবিলাম। এমন সময়ে মনে পড়িল, আমার পরমভক্ত সন্তান শ্রীমান্ কিশোরী শেওড়াফুলিতেই থাকে। প্রেমাঞ্জন গেল খবর দিতে। খাদ্য আসিল, পানীয় আসিল, এদিকে শ্রীমান্ অনিলও অ্যামব্যাস্যাডারখানা নিয়া কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিল। কলিকাতা পৌছিতে দেরী হইল কিন্তু দীক্ষার্থীরা বসিয়াই আছে। বৃষ্টি ছিল খুবই, তাই ত্রিশ-চল্লিশ জনের বেশী দীক্ষার্থী ছিল না। দীক্ষা-কার্য্য সারিয়া আহারে বসিলাম। কিন্তু মুখে অন্ন রুচিল না। কলিকাতায় প্রতি কে-জি চাউল চারি টাকা, তাও আবার চোরা বাজারে সব সময়ে মিলে না। এতগুলি লোককে অভুক্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরিতে দিলাম, আর আমি বসিলাম আহারে। এদেশে অন্নাভাবের এরূপ মূর্ত্তি আর কি কখনো দেখা গিয়াছে? কিন্তু তার চেয়েও বিপজ্জনক কথা, জনসাধারণের ক্ষুধার্ত্ত জঠর আজ বিশৃঙ্খল আন্দোলনের পথ ধরিয়াছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ত' আন্দোলনে দমিত হয় না, আশ্বাস-বচনেও না। দুর্ভিক্ষ-দমন হয় সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক কঠোর শ্রমে। চাউলের দাম আপাততঃ কমিলেও দুর্ভিক্ষ দূর হইবে না, যদি উৎপাদনেরও চেষ্টায় লক্ষ লক্ষ লোককে অনলস প্রযত্নে নামিয়া যাইতে বাধ্য না করা যায়। দু-বিঘা বা পাঁচ-বিঘা জমির মালিক অলাভজনক বলিয়া চাষে করিবে অবহেলা, পঞ্চাশ ষাট বিঘা জমির মালিক মূলধন বিনিয়োগ করিয়া যাহা উৎপাদন করিবে, তাহা লুকাইবে

চোরের গুদামে,—এভাবে চলিলেও দুর্ভিক্ষ-দমন হইবে না। ছোট ছোট চাষাদের সমবায় ভিত্তিতে একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করিতে বাধ্য করিতে পারিলে ফলন বাড়িবে সুনিশ্চিত কিন্তু সমবায়-সমিতির পরিচালকেরা মিথ্যা হিসাবের রন্ধ্রপথে যাহাতে সব লাভ ইন্দুরের গর্ত্তে চালান করিয়া না দিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। আশ্বাস-বচন, বড় বড় পরিকল্পনা, বিলাতি বিদ্যার বুক্‌নী, নেতাগিরির জৌলুষ, বিরাট বিরাট অন্নসত্র বা লঙ্গরখানা, কিছুই এই দুর্ভিক্ষকে দমন করিতে পারিবে না। জনসাধারণের চরিত্রে সততা, শ্রমশীলতা, অন্যায্য প্রাপ্তিতে ঘৃণা, অপরের প্রাপ্যের প্রতি নির্লোভতা এবং দেশের প্রতি ইঞ্চি জমিতে সোণা ফলাইবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প যদি সৃষ্টি করা না যায়, তাহা হইলে বিদেশীদের দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া বা দুই দশ হাজার চলন্ত ট্রেণ ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিয়া দুর্ভিক্ষ দমন করা যাইবে না। দুর্ভিক্ষ দমন একটা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত। ব্রত মানে imperative duty. আমাদের প্রত্যেককে দুর্ভিক্ষদমনের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

বাল্যে আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতামহের গৃহে দেখিতাম, দৈনিক পঞ্চাশ হইতে একশত জন অতিথির আকণ্ঠ ভোজন হইতেছে। অনাহুত অতিথি বলিয়া ইঁহাদের কাহারও অনাদর হইবার উপায় ছিল না। দেখিতাম, সারা বৎসর জুড়িয়া পঁয়ত্রিশটী নিঃসম্পর্কিত পরিবারের বিদ্যার্থী বালক সেখানে আহারীয় পাইয়া

পিতামহের ব্যয়ে বিদ্যালয়ে পড়িতেছে। পূজার নববস্ত্র ইহাদের জন্য কেনা হইত আগে, আমারটী তাহার পরে। ইহাদের জন্য চটিজুতা কেনা হইত বলিয়া বংশের জ্যেষ্ঠ আমি, আমার জন্যও চটি ছাড়া অন্য জুতা কেনা হইত না। আমার মা ইহাদের পাতে বড় ভাজাখানা ফেলিয়া ছোটখানা আমার পাতে ফেলিতেন। ইহাদের যদি আধপোয়া দুগ্ধ পরিবেশন করা হইত, আমাকে কদাচ এক বিন্দু বেশী দেওয়া হইত না। বড় পিসিমা লুকাইয়া লুকাইয়া আমাকে দুধের সর খাওয়াইতে গেলে মা তাহাতে আপত্তি করিতেন। বলিতেন,—"সব ছেলেগুলিকে ভাগ করিয়া সমান দিতে হইবে, তারপরে থাকে ত' আমার ছেলে খাইবে, না থাকে ত' খাইবে না।" আমার মা আর আমার পিসিমাতে যত মতান্তর হইত, তার অধিকাংশই এরূপ ব্যাপার নিয়া।

ইহা জীবনের এক চমৎকার শিক্ষা। সমগ্র দেশবাসী দৈনিক ছয় পয়সার বেশী খাদ্য পায় না বলিয়া গান্ধী-মহাত্মা নাকি নিজে ছয় পয়সার বেশী দামের খাদ্য খাইতেন না। তিনি যদি দৈনিক নিজের খোরাকীতে আড়াই তিন হাজার টাকা খরচ করিতেন, তবে বোধ হয় সে টাকার অভাব হইত না। কিন্তু তিনি আদর্শ দেখাইয়াছেন। আমরা নিজেদের খোরাকীর বরাদ্দ এমন বাড়ান বাড়াইয়াছি যে, নিজের কুকুর পোষার জন্য মাসে যদি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হইয়া যায়, তবু অন্তরে লজ্জা অনুভব করি না। আমাদের বুলি দাঁড়াইয়াছে,— জীবিকার মান উন্নয়িত করিব।

এমন অর্থহীন ফাঁকা বুলি বর্ত্তমান অবস্থায় বোধ হয় আর কিছুই হয় না। আমাদের আজ, এই মুহূর্ত্তে, একটী নিমেষ কালও দেরী না করিয়া যাহা করা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে চরিত্রের মান-উন্নয়ন। যাহার কথায় কোনও মূল্য নাই, তাহাকে তোমরা ভোট দিয়া রাজধানীতে পঠোইতেছ। যাহারা পাঁচ পয়সার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, তাহাদিগকে তোমরা কোটি কোটি স্বর্ণ-মুদ্রার তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতেছ। দেশে গণতন্ত্র হইয়াছে কিন্তু গণশক্তির এমন অপব্যবহারের বা অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত আর কোথায়? সকল দুর্ভাগ্যের শিকড় এইখানে। তোমরা সচ্চরিত্রতার আন্দোলন করিয়া সকল দুর্ব্বলতার মূলকে উৎপাটন কর। দুদিনের কাজ ইহা নহে, দশ বছর, বিশ বছর, পঞ্চাশ বছর বা এক শতাব্দীও ইহাতে লাগিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাই কাজের কাজ। বুদ্ধির ভুলে, কুমতলবে, প্রলোভনে পড়িয়া বা অপরের প্ররোচনায় কুকাজ করিয়া সাহস করিয়া যে তাহা স্বীকার করিতে পারে, বলিব, তাহার চরিত্রে বলের সঞ্চার হইয়াছে। গান্ধীজী হিমালয়-প্রমাণ ভুল করিয়াছিলেন কিন্তু ভুল বুঝা মাত্র স্বীকার করিবার সৎসাহস তাঁহার ছিল। এজন্যই তিনি মহাত্মা। অন্য বড় বড় নেতারা কেহ মহাত্মা হইতে পারিলেন না।

অত্যধিক আধুনিকতার ঘূণ যাঁহাদের মস্তিষ্ক চিবাইয়া খাইতেছে, সচ্চরিত্রতার আন্দোলনকে তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলিয়া গালি দিতে পারেন। অথবা, পারেন বলিব কেন, অনেকে

গালি দিয়াছেনও। প্রাচীনকালের অনেক আদর্শ পুরুষ ইঁহাদের বিচারে নিতান্ত গ্রাম্য নির্ব্বোধ। রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন ইহাদের নিকট illogical idiotcy বা ন্যায়শাস্ত্রের অননুমোদিত মূঢ়তা এবং প্রজারঞ্জনার্থ সীতানির্ব্বাসন ইহাদের নিকটে অর্থহীন অবিচার, পরন্তু অপরের বিবাহিতা পত্নীকে নিজ পত্নীরূপে পাইবার জন্য অষ্টম এডোয়ার্ডের ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন ত্যাগ ইহাদের নিকটে প্রেমিকতার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত এবং অভূতপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চারয়িতা। রামচন্দ্র দৃষ্টি দিয়াছিলেন প্রজার সুখে, এডোয়ার্ড দৃষ্টি দিয়াছিলেন নিজের সুখে,—এই বিরাট পার্থক্যটুকু ইহাদের চোখে ধরা পড়ে না। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টের জেফ্তাহা যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিলে প্রথমেই যে প্রিয়বস্তু দেখিবেন, তাহ দেবতাকে উৎসর্গ করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জয়ী হইয়া তিনি ফিরিয়াও আসিলেন। কিন্তু হায়, নগরের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল তাঁহার প্রিয়া কন্যা। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তিনি হৃদয়-রক্ত মৌক্ষণ করিতে করিতে প্রাণসমা প্রিয়া কন্যাকে দেবতার চরণেই দিলেন। ইহাকে নিষ্ঠুরতা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কিন্তু এমন অদেয় বস্তুকে ত্যাগ করিবার সাহস তাহার আসিল কোথা হইতে? চরিত্রবল হইতে নহে কি? চরিত্রের প্রথম লক্ষণ সত্য, দ্বিতীয় লক্ষণ সংযম, তৃতীয় লক্ষণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া বাক্যোচ্চারণ বা শপথ গ্রহণ। ক্ষমতায় আসিলে চোরাকারবারীদিগকে ফাঁসী দিব বলিয়া শপথবাক্য উচ্চারণ

করিবার পরে যদি কেহ সত্যই ক্ষমতায় আসে আর চোরা-কারবারীরা শাসন না পাইয়া বরং প্রশ্রয় পায়, তবে বলিতে হইবে চরিত্রবলের এখানে অভাব আছে। শ্যামাপ্রসাদ জিদ করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিলেন, ইহাকে হঠকারিতা বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া চলে কিন্তু চরিত্রবল ছিল বলিয়াই তিনি এমন কাণ্ড করিলেন এবং কে জানে, হয়ত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফলেই অকালে মূল্যবান্ জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত হইয়াও নিজের ব্রত পরিহার করেন নাই, —চরিত্রবল ইহাকেই বলে। মহাত্মা গান্ধীর সহিত মতভেদ প্রকাশ করিলে দেশজোড়া বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হইবে জানিয়াও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া শফর করিলেন এবং দেশবাসীকে শুনাইলেন যে, গান্ধীজীর মতের পরিবর্ত্তন-সাধন দেশের কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন হইয়াছে। নানা স্থানে তাঁহাকে অনুচিত আচরণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তবু তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, কোনও স্বার্থের লোভেই তাহা হইতে বিরত হন নাই,—এখানেই মানুষটীর চরিত্রবলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এই চরিত্র-বল আসে সত্য হইতে এবং সত্য দেয় সংযম। চাষার ছেলেরাও আজ চাকুরী করিতে সহরে ছুটিতেছে। কারণ, হয় তাহার চাষের জমি নাই, নয় তাহার চাষে রুচি নাই। কিম্বা এমনও হইতে পারে, হাল-গরু রাখিয়া চাষ চালাইবার তাহার মূলধন নাই। বস্তুতঃ যাহার অন্য একটা সহযোগী আয়ের পন্থা

নাই, যাহা হইতে বছর বছর চাষের মূলধনটা আসিতে পারে, তার পক্ষে চাষ অলাভজনক। কারণ, তাহাকে মহাজনের কাছে সার, গোবর, বীজ, মজুর, হাল ও লাঙ্গলের জন্য হাত পাতিতেই হইবে। তাহার অর্থ এই যে, উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ অন্য লোকের ঘরে তুলিয়া দিতে হইবে। সহরে সারাদিন কলম-পেষা চাকুরী করিয়া রাত্রে আসিয়া ঘরে সে কি চর্চ্চা করিবে? সন্তানের পর সন্তান বাড়িতেছে। চরিত্র-বোধ-বর্জ্জিত বুদ্ধিদাতারা বলিতেছেন, লুপ নাও, অস্ত্রোপচার কর, যত দ্রুত পার গর্ভনিপাতকে আইনসঙ্গত কর। সুদীর্ঘকাল দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া চলিবার সফল দৃষ্টান্ত সমূহ এদেশে রহিয়াছে কিন্তু সেই দিকে কাহারও নজর পড়িতেছে না। চরিত্র শক্ত হইবে কি করিয়া? চারিদিকের পরিস্থিতি চরিত্রকে দুর্ব্বল করিবার অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু তোমাদের চরিত্র-আন্দোলনকেই চালাইয়া যাইতে হইবে। কারণ চারিত্রিক সাফল্য হইতেই আমাদের ভবিষ্যতের সর্ব্বপ্রকার সাফল্য আসিবে।

Taboo-র নিন্দা সব আধুনিকেরাই করেন। অমুক অমুক সম্পর্ক থাকিলে নারী-পুরুষের যৌন-মিলন চলিবে না। গোষ্ঠীর বাহিরে হইলেও চলিবে না। নিজ গোষ্ঠীর ভিতরেই বিবাহ বা যৌন-মিলনকে গণ্ডীবদ্ধ রাখিতে হইবে কিন্তু ঘনিষ্ঠতার অমুক অমুক গণ্ডী ছেদন করা চলিবে না। যৌবনের উদ্দাম চিত্তকে এ সকল নিষেধাজ্ঞা অনেক স্থলেই বেড়া দিয়া ঠেকায়। এই সকল

নিষেধাজ্ঞা জীবনের জটিল সমস্যার অনেক স্থলে সমাধান করিয়া দেয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিতেন, কনের নাম আর মায়ের নাম যদি এক হয়, তবে এমন কনের সহিত বিবাহ চলিবে না। তাঁহারা বলিতেন, কনে যদি বয়সে বড় হয়, তবে তার সহিত বিবাহ চলিবে না। এই যে "চলিবে না" কথাটা, ইহা একটা বেড়া। নতুবা কত যে মাতৃসমা, জ্যেষ্ঠাসমা মেয়ের উপরে যৌবনের অনাচার ঘটিয়া যাইত, বলিবার নহে। এই নিষেধাজ্ঞাগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য, সকলের চরিত্রবল বৃদ্ধি করা। কতকগুলি ভেড়ার পাল সৃষ্টি ইহার উদ্দেশ্য নহে।

পত্র দীর্ঘ হইয়া গেল। পাওয়া মাত্র চিহ্নিত কয়েকটী অংশের নকল বিভিন্ন স্থানে পাঠাইও। বিবাহের ব্যাপারে চারিদিকে একটা অরাজকতা চলিয়াছে। কিন্তু তাহা অবাঞ্ছনীয়। বিবাহ একটা সামাজিক আনন্দের ব্যাপার। বিবাহটীর উপরে আত্মীয়-পরিজন সকলের বা তাঁহাদের অধিকাংশের স্নিগ্ধ সমর্থন বড়ই প্রয়োজনীয়। নতুবা পরে সংসারটা মরুভূমির ওয়েসিস্ হইয়া দাঁড়ায়! স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম ধর অটুটই রহিল কিন্তু চারিদিকের উষ্ণ মরুবায়ু উত্তাপে উত্তাপে ইহাদের ত' দগ্ধ করেই, উপরন্তু বেশী দগ্ধ হয় সেই নবজাত কচি শিশুরা, যাহারা এই বিবাহের না ছিল স্বপক্ষে, না ছিল বিপক্ষে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

কলিকাতা
২২শে শ্রাবণ, ১৩৭৪
(৮-৮-৬৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদ্য বাগুইআটিতে কৃষ্ণপুর রোডে সমবেত উপাসনার দ্বারা একটী গৃহ-প্রবেশ হইল। বড়ই আনন্দ পাইলাম। এই মাঙ্গলিক কাজটুকুর আসল উদ্দেশ্য কি? এই গৃহের প্রতিটি ইষ্টক-খণ্ডে সৎচিন্তা ও সত্য চিন্তাকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া। কাদা ছানিয়া ইটখানা যে গড়িয়াছে, সে ইট গড়িতে গড়িতে নিশ্চয়ই কিছু ভাবিয়াছে। তাহার ভাবনা যদি অসৎ হইয়া থাকে, তবে তাহার খণ্ডন প্রয়োজন। তাহার ভাবনা যদি সৎ হইয়া থাকে, তবে তাহার ঔজ্জ্বল্য-বিধান প্রয়োজন। কাঁচা ইটখানা অগ্নিতে দগ্ধ হইল, তাহার পরসংস্পর্শজনিত কুপ্রভাব ইহাতে দূর হইল। কেন না, অগ্নি কেবল দাহকই নহে, পাবকও। কিন্তু সৎসংস্পর্শজনিত সুপ্রভাবকে অগ্নিও নষ্ট করিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের মল ও মলিন বস্তু পচিয়া সার হয় এবং সেই সার তরু-লতা-গুল্মাদির পুষ্টি-বিধান করে, ফল, ফুল, কিশলয়ের বিকাশ ঘটায়। কুবস্তুর এইরূপ সুপরিণতি ঘটায় বায়ু, কেন না বায়ু কেবল শোষকই নহে, শোধকও। কিন্তু সচ্চিন্তা অগ্নি বা বায়ু অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধিবিধায়ক মহাবস্তু।

অগ্নি বা বায়ু যাহা করে, জলও তাহা করে। জলকে জীবনও বলা হয়। কিন্তু সচ্চিন্তা জীবনেরও জীবন. গৃহপ্রবেশকালে সচ্চিন্তার প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও ঔজ্জ্বল্য-সম্পাদনের জন্যই গৃহপ্রতিষ্ঠারূপ মাঙ্গলিক কাজ। যে-কোনও প্রথার অনুশাসন করিয়াই ইহা কর, ইহাতে অন্তরের শুচিতা বর্দ্ধিত হয়। যাহা শুচিতা-বর্দ্ধক, তাহা শান্তিরও বর্দ্ধক, তাহা পরমায়ুরও বর্দ্ধক।

ভাড়াটিয়া ভাড়াটে বাড়ীতে ঢুকিতেছে, সেখানেও আমি গৃহ-প্রবেশ রূপ একটী অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়াছি। প্রথমতঃ ইহা নিতান্তই বাড়াবাড়ি মনে হইবে। নবগৃহেই ইহা সাজে। কিন্তু উক্ত স্থলেও ইহা নিতান্তই হাস্যকর নহে। বছরে যদি তিনবার ভাড়াটে বাড়ী বদল হয়, তাহা হইলে তিনবার গৃহপ্রবেশ করিতে হইবে। দশজনকে লইয়া বছরে তিনবার করিয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু একাও একাজ তুমি করিতে পার। বসিয়া যাও ইষ্টমন্ত্র জপে। আগে ঘরগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন কর, তারপরে স্বামী ও স্ত্রীতে নাম জপে লাগিয়া যাও। জপ করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অদৃশ্য অশুচিতা দূর কর, নাম জপের শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের যত অনাদৃত সচ্চিন্তাকে প্রখর ও প্রবল করিয়া তোল। ঘন ঘন যাহার গৃহ-বদল, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। লোকদেখান গৃহপ্রবেশ অপেক্ষা এই নীরব নিভৃত একান্ত অনুষ্ঠানটী অধিকতর মনোজ্ঞ হইবে।

ফলপ্রদও। কেহ হয়ত এই ঘরটীতেই গোপনে করিয়া গিয়াছে

নারকীয় অনুষ্ঠান। কেহ হয়ত করিয়াছে বীভৎসতার অনুশীলন। কেহ হয়ত চূড়ান্ত বর্ব্বরতার পাপিষ্ঠতম দৃষ্টান্ত-স্থাপন এ ঘরেই করিয়াছে। কে কি করিয়া গিয়াছে, তুমি ত' জান না। তোমাকে তাহাদের কৃত পাপের সম্পূর্ণ নির্ব্বাসন বিধান করিতে হইবে। "একবার ইষ্টনামে যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে",—এই উক্তির সত্যতায় তুমি বিশ্বাস করিও এবং নিবিষ্ট চিত্তে নাম জপ করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের সকল পাপকে নির্ম্মূল করিও, পাপীকে উদ্ধার করিও। যতক্ষণ চিন্তাটী জগতে রহিয়াছে, ততক্ষণ চিন্তার জনকের দুঃখের অবধি নাই। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন চক্রবৃদ্ধির সূদ গণিতে গণিতে কাবার হয়, তাহার অবস্থা তদ্রূপ। তুমি তোমার ব্যাকুল ইষ্টনামস্মরণের দ্বারা স্থানিক সকল কুচিন্তাকে লুপ্ত করিয়া দিয়া ঐ ঐ কুচিন্তার অনুশীলনকারী হতভাগ্যদের আত্মোদ্ধার সহজ করিয়া দিবে। উপকার কেবল তোমার একার হইল না, উপকার হইল তাহাদেরও। এমন কাজ করিতে কি কখনো হেলা করিতে হয়?

কতলোক মরিয়া গিয়াছে, মরিয়া যাইতেছে। বাকী সব লোকও মরিয়া যাইবে। চিরজীবী কেহই ছিল না, থাকিবেও না। কিন্তু তাহাদের চিন্তাগুলি থাকিয়া যায়। কাহারও চিন্তা এই জগতে মানুষের বন্ধু রূপে রহিয়া যায়, কাহারও চিন্তা রহিয়া যায় পরম শত্রু রূপে। বন্ধুকে নিকটতর করিতে হইবে, শত্রুকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। তোমার জপ তাহারই জন্য।

মনটীকে তুলিতে হইবে ইন্দ্রিয়-জগতের ঊর্দ্ধে। আকাঙ্ক্ষাকে টানিয়া নিতে হইবে ইন্দ্রিয়-লালসার গণ্ডীর একেবারে বাহিরে। কামনাগুলিকে করিতে হইবে আত্মমুখীর বদলে বিশ্বতোমুখী। তবেই তুমি মানুষ হইলে, নতুবা চিরকালই একটা জন্তু বা জানোয়ার থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ইহার উপায় পরমেশ্বরের নামজপ।

বহু দিন বহু নাম না জপিয়া প্রতিদিন একটী নামই জপিও। কারণ, "জপের শত্রু বহুমন্ত্র।" একজনের এক নামেই প্রাণ দিয়া মন দিয়া লাগিয়া থাকা ভাল। দীক্ষা পাইবার আগ পর্য্যন্ত মনের রুচি বুঝিয়া, ঝোঁক বুঝিয়া, তৃপ্তি বুঝিয়া দুই, তিন বা চারটী নাম জপ কেহ করিয়া গেলে আমি বাধা দেই না। কারণ, সে ত' এখনো একটীকে বাছিয়া নিবার সুযোগ পায় নাই। জপুক সব নামই ভক্তি-ভরে। সব নামই ভগবানের কিন্তু সব নামের অর্থ ত' এক নহে। এক এক নামের এক এক বিশেষত্ব, এক এক নামের এক এক মহিমা। ভগবান যেমন অনন্ত, তাঁর নামও তেমন অনন্ত। তাঁহার কোনও নামই অনাদরের নহে।

কিন্তু দীক্ষা পাইবার পরে নানা নামে ডাকিবার জরুরী প্রয়োজনটী ফুরাইয়া যায়। তখন আস্তে আস্তে আগের অভ্যস্ত নামগুলি সরিয়া যাইতে থাকে বা সাধ্য হইলে এক কথায়ই সরাইয়া দেওয়া উচিত। জল পাইতে চাও ত' কূয়ার মাটি এক জায়গায়ই খোঁড়, স্থানে স্থানে কেন? সব মাটির নীচেই জল মিলিবে, কিন্তু তাই বলিয়া লোকে সর্ব্বত্রই কূয়া খুঁড়িয়া বেড়ায় না। একটা

স্থানেই খোঁড়ে। দীক্ষাপ্রাপ্ত নামকে তদ্রূপ জানিবে। ঐখানেই তোমাকে খুঁড়িতে হইবে। চট্টগ্রাম বা ত্রিপুরায় খুঁড়িলে পাঁচ দশ ফুটে জল মিলে, বিকানীর বা জৈসলমিরে খুঁড়িলে দুই শত ফুটে মিলিবে কিন্তু খুঁড়িতেই যদি থাক, জল মিলিবেই মিলিবে। হতোদ্যম না হইয়া তোমার কর্ত্তব্য কেবল খুঁড়িয়া যাওয়া।

তুমি যদি অন্য গুরুর নিকট অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাক, তবে তোমার সহিত আমার কলহ নাই। আমি তোমাকে ঐ মন্ত্র ছাড়াইয়া আমার কাছ হইতে আমার মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলিব না। তবে তুমি যদি আমার নিকটেই দীক্ষিত হইতে চাহ, তবে আমি একটী মাত্র মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রে দীক্ষা দিব না। সেই মন্ত্র ওঙ্কার। যে যেই মন্ত্রই জপ করুক, জপে যদি লাগিয়াই থাকে, তবে তাহার চরম গন্তব্য ওঙ্কারে, পরম প্রাপ্তব্য ওঙ্কারে, যে ওঙ্কারে সে সর্ব্ব মন্ত্রের, সর্ব্ব তন্ত্রের, সর্ব্ব পথের, সর্ব্ব মতের পাইয়া যাইবে সমন্বয়, সমাহার ও সারতত্ত্ব। এই জন্যই সমবেত উপাসনায় পূজার বেদীতে রাখিয়াছি একমাত্র ওঙ্কার, কিন্তু নীরব নামজপের সময়ে যে যার স্বকীয় ইষ্টমন্ত্র কুণ্ঠাহীন মনে জপিতে পারে।

অপরকে নিজ মত নিজ পথ পরিহার করাইয়া আমার দলে আনিয়া ভিড়াইবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে থাকিয়া একান্ত ভাবে ঈশ্বরের নামের অনুগত পবিত্র জীবন যাপন করুক। কারণ, জগতে নির্দ্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়ের লোকের

হ্রাস-বৃদ্ধিতে কিছুই যায় আসে না, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণী অপর সকল সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি প্রেমারুণ আঁখিতে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে শিখুক, ইহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতই ঈশ্বরভক্ত না হইলে জীবে জীবে অকপট প্রেম জাগে না। এজন্যই আমরা বলি, অবিরাম অবিশ্রাম নিত্য নিরন্তর তাঁহার নাম কর। উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, কর্ম্মে, বিশ্রামে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় কর নাম। প্রেমময় পরমেশ্বরের পরম পবিত্র নাম তোমাদের প্রাণে প্রেমের উজ্জীবন করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
বৃহস্পতিবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৪
(১০-৮-৬৭ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সন্ধ্যা হইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পুপুন্‌কী আসিয়া পৌছিলাম। বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। জাতীয় সড়কের পাশেই মালপত্র সহ নামিতে হইল। এখন পৌনে এক মাইল পথ কাদার মধ্য দিয়া হাটিয়া যাইতে হইবে। বৃষ্টি না হইলে মটরে চলিবার পক্ষে এ রাস্তা

চমৎকার। একচল্লিশটী বৎসর পার হইয়া গেল, কিন্তু রাস্তার একটা সুবিধা করিতে পারিলাম না। টাকা খরচ করিতে আমার কুণ্ঠা নাই কিন্তু চারিদিকের সহযোগ প্রয়োজন। জমির মূল্য দিতে চাই, বেচিবে না। আগাগোড়া মোটালিং-এর খরচ দিতে চাই, কিন্তু যাঁহাদের নৈতিক সাহায্য ছাড়া একাজ সম্পূর্ণ হইবে না, তাঁহারা উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্র-সুভাষের দেশের একটী সাধুকে নিয়ত সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। ছোট-বড় প্রত্যেকে এই আশ্রমটীতে আসে নিজ নিজ প্রয়োজনে, আমাদের প্রয়োজনে নহে কিন্তু তাহাদের নিজেদেরই যে আসা-যাওয়ার অসুবিধা নিবারণের প্রয়োজন আছে, এই কথাটা বেমালুম ভুলিয়া যায়। কারণ, তাহাদের আসা-যাওয়ার প্রয়োজন নৈমিত্তিক, আমাদের আসা-যাওয়ার প্রয়োজন নিত্য। কি যে মূঢ় এক বিদ্বেষান্ধতা মানুষের মনে ক্রিয়া করিতেছে, ভাবিতে লজ্জা বোধ করি। গান্ধানিবাসী একটী বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিলেন,—লক্ষ লক্ষ টাকা আপনি এদেশের লোকের কল্যাণে খরচ করিলেন কিন্তু একটা মানুষও কিনিতে পারিলেন না। হয়ত তাঁহার এই আটেপোক্তি সত্য।

কাদায় হাটিতে কিন্তু আনন্দই হইতেছিল। সমুৎসুক কৌতূহল আমাকে মঙ্গলসাগরের দক্ষিণতম প্রান্তে টানিয়া নিতেছিল। কি দেখিব, কি কলরব শুনিব, কেমন জানি মনের অবস্থা হইবে। উপরের গ্রামগুলির ক্ষেতের উপচান জলটাকে নির্দ্দিষ্ট খাতে

মঙ্গল-সাগরে আনিয়া ফেলিবার জন্য গত চারিবৎসর ধরিয়া একটা পরিকল্পনানুযায়ী কত কংক্রিট পিটাইয়াছি, কত ইট গাঁথিয়াছি, —হিসাবে আমার ভুল হয় নাই ত'! জলের ব্যাপার। অভিজ্ঞতাও নাই, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও নাই, শুধু মিঃ কাণ্ডজ্ঞানের নির্দ্দেশ মত কাজ করিয়া গিয়াছি আর কাণ্ডজ্ঞানকে পরিচালিত করিয়াছেন অলক্ষ্যে শ্রীভগবান্।

নগেশ-ব্রীজের উপরে পৌছিবার পূর্ব্বেই জলকল্লোল শুনিলাম। অসমাপ্ত ব্রীজের উপরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম মন্দাকিনী-ধারা গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। নগেশ-বাঁধ ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু ক্ষতি নাই, উহা সিমেণ্টে গাঁথা ও পাথরে তৈরী। জলোচ্ছ্বাস একটু কমিলেই তাহা নয়ন-গোচর হইবে। জলের উচ্চতা যতটুকু বাড়ান প্রয়োজন, তাহা সে বাড়াইতে পারিয়াছে। অরবিন্দ-বাঁধ নিশ্চিন্তে দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা জলের উচ্চতা বাড়াইয়াছে কিন্তু মঙ্গল-সাগরের অখণ্ডত্ব ক্ষুণ্ণ করে নাই। গরিলা যুদ্ধে জলদেবতাকে কিঞ্চিৎ ক্ষীণবল করিবার আমার দুর্ব্বল প্রয়াস একেবারে মিথ্যা ও অর্থহীন বলিয়া আর মনে হইল না। যদি বর্ষার আগামী কয়টা সপ্তাহে নূতন বাঁধ দুইটির উপরে কোনও নিদারুণ দুর্ঘটনা না ঘটিয়া যায়, তবে কাজের যেখানে যাহা ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা আগামী গ্রীষ্মে সংশোধন করা যাইবে।

কিন্তু সব চেয়ে বড় আনন্দ, বুভুক্ষুরা এখনো এখানে নিজ নিজ অন্ন কুড়াইয়া নিতেছে। তাহাদের অন্তরের অনুচ্চারিত আনন্দ নগেশ-ব্রীজের জলকল্লোলের চেয়ে অধিকতর মুখর হইয়া আমার কাণে ও প্রাণে বাজিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে নানা প্রয়োজনে সঞ্চিত সবগুলি অর্থভাণ্ডার ইহাদের জন্য উজাড় করিয়া দিতে পারিয়াছি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আসে নাই। নিজের ব্যক্তিগত বহু জিনিষপত্র সাধ্যমত বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি, মায়া-মমতা বাধা দেয় নাই। এই চিন্তায় আমার অন্তরের আত্মপ্রসাদ এই দুই কল্লোলের সহিত যোগ দিল। মনে হইল, আমি ধূর্জ্জটী হইয়া পুণ্যতোয়া গঙ্গার সবটুকু ধারা নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া ত্রিশূল হস্তে মহানন্দে নৃত্য করিতেছি। * * * আত্মপ্রসাদ যে কি বস্তু, তাহার কি বর্ণনা দিব। বুভুক্ষুর অন্নদান-যজ্ঞে যাহারা আমার হস্তে সমিধ তুলিয়া দিয়াছিলে, তাহারা আজ আমার এই আনন্দের অংশ গ্রহণ কর।

মানুষের পেটের ক্ষুধা চিরকালই থাকিবে। কতকাল তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া পারিবে? ভিক্ষাটন বা ভিক্ষাদান, কোনওটাই মানুষের দুর্ভিক্ষ-নিবারণ করিবে না। যাহা করিলে ভিক্ষাটন চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং দয়ালু মানুষদের ভিক্ষাদানের কোনও প্রয়োজন আর থাকিবে না, করিতে হইবে তাহাই। সরকারী টেষ্ট রিলিফে যতটুকু মাটিকাটার বদলে যতটুকু অন্ন দেওয়া হয়, তাহাতে বুভুক্ষুর প্রাণ বাঁচে না। ঐ-জাতীয় রিলিফের আবশ্যকতাই যাহাতে জাতীয়

জীবনে না থাকে, তেমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভিক্ষা চাহিবার প্রবৃত্তিকে দূর করিয়া দিবার জন্য একদিকে যেমন আপ্রাণ চেষ্টা পাইতে হইবে, ভিক্ষা দিবার প্রয়োজনকে তেমন লুপ্ত করিতে হইবে। মানুষের অন্তরে দয়া, মায়া, মমতা ও সহানুভূতির প্রবণতা নষ্ট করিয়া দিয়া যে স্বাবলম্বনের আন্দোলন, তাহাও প্রকৃত পথ নহে। ভিখারী না থাকিলে দাতারা কাহাকে দান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবেন, ইহাও যেমন কুযুক্তি, প্রয়োজনে পড়িয়া এক মানুষ অন্য মানুষের কাছে সাহায্য চাহিলে তাহাকে সাহায্য করা পাপ, ইহাও তেমন কুযুক্তি।

যে যেখানে আছ, নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়াই মানুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার সাহায্য কর। ইহাই প্রকৃত পথ,—ভিক্ষাদানও নহে, ভিক্ষাটনও নহে। সবাই স্বপ্রতিষ্ঠ হইলে ভিখারী থাকিবে না। সবাই স্বপ্রতিষ্ঠ হইলে দাতারা ভিক্ষাদান না করিয়াও মানুষকে সর্ব্বতোমুখ সেবা দান করিয়া কৃতার্থ হইবার স্বচ্ছতর পথ খুঁজিয়া লইবেন। পুণ্যার্থীদের পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যই ভিক্ষার্থীদের অস্তিত্ব প্রয়োজন কিনা এবং ইহাদিগকে ভিক্ষা দিলে পুণ্য হয় কিনা, এবং না দিলে পাপ হয় কিনা, তাহা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিবেককে জিজ্ঞাসা করিবে। এজন্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
শুক্রবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৭৪
(১৮-৮-৬৭ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া হাসিব না কাঁদিব, স্থির করিতে পারিলাম না। ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না যে, তোমাকে সান্ত্বনা দিব, না, তিরস্কার করিব। ছেলেটী তোমার কাহাকেও না বলিয়া-কহিয়া রেজেষ্টারী করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিল এমন একটী মেয়েকে, যাহাকে পুত্রবধূ রূপে আদর করিয়া ঘরে বরণ করিয়া তুলিতে তোমাদের সংস্কারে বাধে। আর মেয়েটী কাহাকেও ঘূণাক্ষরেও কিছু জানিতে না দিয়া বিবাহ ঠিক করিল এমন একটী ছেলের সঙ্গে যাহাকে জামাতা রূপে সমাদর করা তোমাদের পক্ষে অসাধ্য। যাহাদের জন্য জীবন-পণ করিয়া অর্থার্জ্জন ও অর্থব্যয় করিয়াছ, তাহারা জীবনের সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপারে পিতামাতার সহিত এই বিশ্বাসঘাতকতা করিল, ইহা অসহ। কিন্তু অপর দিকে ইহাও ভাবিতে হয় যে, এতকাল তোমরা কি চক্ষু বুজিয়া চলিতেছিলে? এমন ঘটনা ত' হঠাৎ একদিনের খামখেয়ালীতে হয় না। দুইটী অচেনা প্রাণীতে দেখা-সাক্ষাৎ হইতে, ভাব জমিতে, প্রজাপতি-ঋষির আবির্ভাব ঘটিতে নিশ্চয়ই কিছু

সময় লাগে। হয়ত কোনও সুকৌশলী চতুর লোক ব্যাপার দুইটীকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য কিছু শ্রম করিয়াছে কিন্তু যত তাড়াতাড়িই হউক, তোমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যে এত দূর সব গড়াইতে পারিল, ইহাই আশ্চর্য্য।

আমি সান্ত্বনাও দিব না, তিরস্কারও করিব না। পুত্র ও কন্যা দুই জনে এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞাতসারে নিজ নিজ পছন্দ মত পথে ছুটিয়া গিয়াছে কি না, এখন অনুমান করা শক্ত। কিন্তু সাময়িক মোহের প্রভাবে নিজে বিপথে চলিলেও সাধারণতঃ একটী ভাই তার বোন্‌কে বা একটী বোন্ তাহার ভাইকে এরূপ অসামাজিক পথে চলিতে দেখিলে খুশী হয় না এবং তাহার এরূপ চেষ্টার সমর্থনও করে না। ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং তোমাদের পুত্র এবং কন্যা উভয়ে পরামর্শ করিয়া পিতামাতার বুকে যুগ্ম শে বিদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে এইরূপ ষড়যন্ত্রমূলক ধারণা পোষণ না করাই ভাল। সম্ভবতঃ দুই জনেই দুই দিকে ছুটিয়া গিয়াছে গোপন-পদ-সঞ্চারে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে এবং চূড়ান্ত ব্যাপারটা ঘটিয়া যাইবার সময়ে বা পরে সব জানিয়াছে। ইহারা অন্তরের সহিত জানে যে, এই কার্য্য দ্বারা ইহারা তোমাদিগকে গুরুতর আঘাত দিতেছে। ইহা জানিবার পরে এই আঘাতকে দ্বিগুণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি কোনও কুসন্তানেরও হইতে পারে না।

এই পুত্র এবং এই কন্যা উভয়ের মধ্যেই অনেকগুলি সদ্‌গুণ

আছে। কিন্তু সেই সকল সদ্‌গুণ বিকশিত হইতে পারে নাই। মানুষ মাত্রেরই মধ্যে অনেক দুর্ব্বলতা থাকে, ইহাদের দুর্ব্বলতাগুলি পিতামাতার দৃষ্টির অগোচরে প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না।

আমি বলি, ধৈর্য্য ধর। অধীর হইও না। চরিত্র-গঠনের ব্যাপক চেষ্টাকে আমরা দীর্ঘকাল ছাড়িয়া দিয়াছি। দুশ্চরিত্র লোকদিগকে বিগত প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া পূজা করিয়াছি। তাহার ফলে সমগ্র সমাজের চেতনা কলঙ্কিত, কলুষিত, কদর্য্যীভূত হইয়া রহিয়াছে। ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ বিসর্জ্জিত হইয়াছে, অন্যায় উপায়ে ধনাহরণ করিয়া বিলাসিতার পরিতৃপ্তি সর্ব্বসাধারণের লক্ষ্য হইয়াছে। এই পরিবেশে এই জাতীয় অনেক বিভ্রাট আমাদের দেখিতে হইবে, অনেক বিপত্তি আমাদের সহিতে হইবে।

সুতরাং পুনরায় বলিতেছি, এই বিপথগামী বুদ্ধিবিভ্রান্ত পুত্রকন্যার প্রতি রোষ প্রকাশ করিও না, ইহাদের সম্পর্কে উদাসীন হইয়া যাও এবং সত্য সত্যই যদি অন্তরে দারুণ দুঃখ পাইয়া থাক, তবে একান্ত চিত্তে ভগবানের নামে ডুবিয়া যাও। ভগবানের নাম করিতে করিতে প্রসন্ন মন ও প্রশান্ত প্রজ্ঞার অধিকারী হও। ভগবানের নাম করিতে করিতে বিগতভী ও অশোক-অন্তর হইয়া যাও। তারপরে প্রতিজ্ঞা কর যে, দেশব্যাপী যৌন চিন্তার কলুষিত আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের জন্য তোমরা পবিত্রতার দীপ্ত শিখা

জ্বালাইবে, সমগ্র ধরিত্রী ব্যাপিয়া পুণ্য চিন্তার পূত ধারা প্রবাহিত করিবে। একাজে তোমাদের তনু দিবে, মন দিবে, ধন দিবে। একাজে যতগুলি সম্ভব সৎকর্ম্মীকে আত্ম-নিয়োজিত হইতে সহায়তা করিবে। একাজের মধ্য দিয়া অন্তরের সমস্ত জ্বালা মিটাইবে।

বিপথগামী পুত্রকন্যার মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। যে দুইটী কনে ও বরকে তাহারা নিজ নিজ আঁচলের গ্রন্থীতে বাঁধিয়াছে, তাহাদেরও মনের গত্যন্তর ঘটা বিচিত্র নহে। কামমোহে মুগ্ধ হইয়া যাহারা পিতামাতাকে বা নিজ পতি বা পত্নীর পিতামাতাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, অসম্মান করিয়াছে, নিজ নিজ জীবন হইতে কামুকতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা সংযমসুন্দর দেবমূরতি ধারণ করিলেও করিতে যে পারে না, তাহা কে বলিল? যাহারা কামকে জয় করিয়াছে, তাহারা আর উচ্চ জাতিও নহে, নিম্ন জাতিও নহে, তাহারা সাক্ষাৎ শিব অথবা পার্ব্বতী।

অতীত ভারত কি জাতিভেদকে সেই ভাবে মানিয়াছিল, যেই ভাবে আজকাল আমরা মানিতে দেখি? অতীত ভারত মানুষকে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠায় পৌছিয়া দেবত্ব অর্জ্জনের পথ-প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিল। তাই ঋষিরা, ঋষি-পুত্রেরা অকাতরে নিম্নতর বর্ণের কন্যাদিগকে নিজ নিজ ব্রাহ্মণী রূপে তপঃসঙ্গিনী করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। সমাজ তাহার নিন্দা করে নাই, দেশবাসী তাহাতে বাধা দেয় নাই। কামসম্ভোগ যেখানে লক্ষ্য নহে, প্রকৃত জাত্যন্তর পরিণাম সেইখানেই সম্ভব।

তাই পুনরায় বলি, ধৈর্য্য ধর।

তবে, দুঃখ ইহাদের জন্য এই কারণে হয় যে, বিবাহ সামাজিক জীবনের সবার চাইতে আনন্দময় অনুষ্ঠান, যাহাতে, যাহারা বিবাহিত হয়, তাহারাই উৎফুল্ল হয় না, উৎফুল্ল হয় উভয় বংশের প্রতিটি আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু ও বান্ধব। অন্যান্যদের এই উৎফুল্লতা কেবল আনন্দই নহে, বর ও কন্যা উভয়ের পক্ষে উহা একটা অত্যাবশ্যক আশীর্ব্বাদ এবং বলসঞ্চারক অভিনন্দন। ইহারা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এমন পথ কেন বাছিয়া লইল, যাহাতে এই আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন হইতে ইহারা দূরে সরিয়া গেল? এই দূরাপসরণ শুধু ইহাদেরই ক্ষতি নহে, ইহাদের মিলনকে উপলক্ষ্য করিয়া যেই অনাগতেরা ধরণীর মৃত্তিকায় প্রথম নয়ন মেলিবে, তাহারাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দনের ছোঁয়াচ হইতে বঞ্চিত হইল। ইহা স্বীকার্য্য যে, অপরের আশীর্ব্বাদ পাউক আর না পাউক, জীব তাহার কর্ম্মানুসারিণী গতি পাইবেই। কেহ উত্তম তপস্যা করিয়া আসিয়া থাকিলে পরিজনবর্গের আশীর্ব্বাদ আর অভিনন্দন ইহারা পাইল আর না পাইল, তাহাতে কি যায় আসে? কথাটা যুক্তিহীন ও অসার নহে। কিন্তু পরিজনহীন পারিবারিক জীবনে পরিবর্দ্ধিত এই সব নবজাতকেরা যদি উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিজ নিজ পিতামাতার দৃষ্টান্তকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে? সমাজ-নামধেয় নিতান্ত অপছন্দের একটী সংগঠন

জগৎ-সমাজে রহিয়াছে বলিয়াই ত' অধিকাংশ মানুষ ঠেকিয়া না শিখিয়া শুধু দেখিয়া বা শুনিয়াই শিখিবার পথ পাইয়াছে এবং জীবনের সম্ভাবনীয় সহস্র অপ্রীতিকর ঘটনার পেষণ হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে পারিয়াছে। বনের পশুর উদ্দাম উন্মুক্ত জীবন কদাচ মানুষের পক্ষে আদর্শ হইতে পারে না বলিয়াই ত' মানুষ সমাজবদ্ধ হইতে শিখিয়াছে এবং সর্ব্বজনের বা অধিকাংশের কল্যাণকে লক্ষ্যে রাখিয়া নানা প্রথা, অনুষ্ঠান, অনুশাসন ও জীবন-যাপন-প্রণালীকে বিধিবদ্ধ করিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

সোমবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৭৪

(২১-৮-৬৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অখণ্ড-যুব-আন্দোলন বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে কি বুঝায়, তাহা বুঝিয়া নিয়া তবে তোমরা কাজে হাত দিও। হৈ-চৈ করিয়া একটা কাজে নামিয়া গিয়া তার পরে আন্দোলনের কাছে পথ কি হইবে জিজ্ঞাসা করার মতন বাতুলতা আর কিছুই নাই। যে-কোনও কাজ বহু লোককে নিয়া করিতে গেলেই, যে-কোনও একটা

গুরুতর মুহূর্তে তাহার আসল গন্তব্য পথ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন পথে ধাবিত হইবার গুরুতর আশঙ্কা রহিয়াছে। জনতার প্রকৃতির মধ্যেই এই ব্যাপারটা একান্ত ভাবে মজ্জাগত। জনতা লইয়া যাহারা আগুনের খেলা খেলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় প্রতিজনকে ঐ আগুনেই পুড়িয়া মরিতে হইয়াছে। গোড়াকার উদ্দেশ্য তোমাদের যত সুন্দর ও স্বচ্ছই হউক না কেন, অসংখ্য মানুষ লইয়া যখন কাজ চালু হইবে, তখন কোন্ দুষ্ট প্রতিভার অসাধারণ দীপ্তি বা কোন্ কুগ্রহের অকল্পনীয় কুটিলতা সকলের সমষ্টীভূত মনকে কোন্ অবাঞ্ছিত পথে টানিয়া লইয়া যায়, তাহা কে বলিতে পারে?

যুব আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, তরুণ এবং কিশোরদের প্রাণের পরতে উন্নতিমুখিনী চিন্তা এবং প্রগতিপরায়ণ ধ্যান অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া। যে-কোনও দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনকে বাস্তবে রূপদান করিতে হইলে সুদৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন। নিষ্ঠাহীনের উচ্চভাষ সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে কিন্তু জীবন গড়ে না। কিন্তু নিষ্ঠাকে গড়িয়া তুলিতে হইলেই চাই চরিত্র এবং চরিত্র কথাটা একটা বহুব্যাপক বিরাট জিনিষ হইলেও, ইহার গঠনের মূলদেশে ব্রহ্মচর্য্য এবং তদনুকূল সুরুচিপূর্ণ চিন্তাকে আনিয়া দুরমুজ পিটাইয়া শক্ত করিয়া বসাইয়া দিতে হয়।

ইহাই যখন আসল কথা, তখন ইহার প্রচারের জন্য এমন কিছু করার মোটেই প্রয়োজন পড়ে না, যাহাতে বাহ্যাড়ম্বর চাইই

চাই। ঘটা করিয়া আনিয়া মানুষ জুটাইয়া নিয়া কতকগুলি অর্থব্যয়সাধ্য তুমুল ব্যাপারের অনুষ্ঠান ইহাতে আবশ্যক নহে। সমাজের যে যে সৎসেবা অর্থ ব্যতীত চলে না, সেই সকল কাজে তোমরা অর্থের সমাহার-বিধান কর কিন্তু যুবকদের ভিতরে চরিত্রোন্নয়ন-বিধানের চেষ্টায় বহুব্যয়সাধ্য কোনও কিছু করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ অতি অল্প ক্ষেত্রেই আছে। একাজটীতে যাহারা ব্রতী হইবে, তাপস বালকদের মতন সরল ও শাদা মন লইয়া তাহারা তরুণদিগকে ডাকিয়া বলিবে,— ভাই, সুন্দর হও, পবিত্র হও, বলশালী হও। বলিবে,—নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই যথার্থ সৌন্দর্য্য, সংযমের বলই যথার্থ বল। বলিবে,—দেহের পবিত্রতা শারীরিক কুশলের জন্য প্রয়োজন, মনের পবিত্রতা দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সব-কিছুর কুশলের জন্য প্রয়োজন। একক চেষ্টায় এই কথাটুকু বলিয়া যাইবার জন্য তোমার প্রথম প্রয়োজন নিজের ভিতরে ঐ সংযম, ঐ সচ্চরিত্রতা, ঐ পবিত্রতাকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিষ্ঠা করা, দ্বিতীয় প্রয়োজন হইতেছে স্থান-স্থানান্তরে যাইবার জন্য পাথেয়, খাদ্য, পানীয়। ইহার অতিরিক্ত অর্থ-ব্যবস্থা থাকিলেও সেই অর্থ অন্য কোনও বাস্তব জনহিতে নিয়োগ করাই সঙ্গত।

যখন তোমরা দশজনে মিলিত হইয়া এই কাজটীতে হাত দিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিবার জন্য সহস্র জনের সমাবেশ হউক, ইহা নিশ্চয়ই কাম্য। একজনে একা করিতেছিলে, তাহার

নাম নীরব নিষ্কাম সেবা। কিন্তু দশজনে এককাজে যুগপৎ হাত লাগাইলেই তাহার নাম হইয়া পড়িল আন্দোলন। একক সেবার চেয়ে আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্র ব্যাপকতর। এজন্য আন্দোলনও নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আন্দোলনের ভিতরে বাহ্য ভড়ং বেশী থাকে, যাহার ফলে অগঠিত চরিত্রের লোকটীও হঠাৎ প্রতিভাবলে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু হঠাৎ-দুর্ব্বলতায় একদিন সে রণে ভঙ্গও দিতে পারে। আন্দোলনের এই জাতীয় বহু ত্রুটি রহিয়াছে, যাহার জন্য ভারতের সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধকেরা আন্দোলনকে অধিকাংশ সময়েই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু আন্দোলনেরও নিজস্ব ক্ষেত্র আছে এবং দেশে চরিত্রের মান যে ভাবে গোটা পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একেবারে রসাতলে নামিয়া গেল, তাহাতে এখন দেশের জনসাধারণের চরিত্রোন্নয়নের জন্য আন্দোলনই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চরিত্রান্দোলনকে নাচ, গান, নাট্য, কৌতুক, ধাপ্পা ও ভাঁড়ামি দিয়া ভারাক্রান্ত করিয়া তোমরা এই আন্দোলনের নিজস্ব মহিমাকে খর্ব্বিত হইতে দিও না। অত্যুগ্র আধুনিকতা নহে, আমাদের দেশের সুপ্রাচীন সাত্ত্বিকতাই এই আন্দোলনের যোগ্যতম উপচার। কাব্যের কাকলি অপেক্ষা অনুশীলনের সহজ-সাধ্য প্রণালী এক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী। এ আন্দোলন করিয়া তোমরা ইটালীর রেনেসাঁসের কীর্ত্তি রাখিবে, এই কল্পনা ছাড়িতে হইবে। পুত্ত, বাদল, অভিমন্যুর দল এদেশে পুনরাবির্ভূত হইতে চলিয়াছে, এই

স্বপ্নকে জাগ্রতে রাখিয়া করিবে কাজ। শৌর্য্যহীন সঙ্গীত, বীর্য্যহীন সুর, ক্লীব দুর্ব্বল নিরুদ্যম কাপুরুষের দৃষ্টান্ত,—ইহা তোমাদের শ্লাঘ্য হইবে না। কাব্য বা সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি তোমাদের দ্বারা কিছুই যদি না হইল, ভাবিবার কিছু নাই, তোমাদিগকে জীবনের কাব্য রচনা করিতে হইবে, নিদারুণ সংঘাত ও সংঘর্ষ সত্ত্বেও যে জীবন পরপদতলে লুটাইয়া পড়ে না, সমুন্নত শিরে অনন্ত স্পর্দ্ধায় স্ফীত বক্ষে নিজের পায়ে নিজের শক্তিতে দাঁড়াইয়া থাকে, সেই জীবনের, সেই যৌবনের করিবে তোমরা আরাধনা।

কাজে যখন নামিতেছ, আগে লক্ষ্য স্থির কর। লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরের মত অকারণে যথা তথা ক্ষত সৃষ্টি করিয়া সংসারের অকুশল ও ক্রন্দন বাড়াইও না।

তোমরা "টাকা" "টাকা" করিয়া চীৎকার করিও না। অধিকাংশ সৎ আন্দোলনই বিনা টাকায় বা অল্প টাকায় চালানো যায়। তবে কাজ করিবার জন্য মানুষ চাই। এই মানুষগুলি কেবল মানুষই নহে, মানুষ-রত্ন এবং এজন্যই দুর্ল্লভ। দুর্ল্লভ মানুষ-রতনদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তোমাদের একটু শ্রম করিতে হইবে। কিছুকাল অন্বেষণ চালাইবার পরেই দেখিতে পাইবে যে, কত স্থানে যে কত জন কাজ করিবার সুযোগ পাইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল, বলিবার নহে। কাজের চিন্তাটা ইহাদের কাছে কেহ ছুঁড়িয়া দেয় নাই, তাই ইহারা কাজটাকে লুফিয়া নিবার চেষ্টা করে নাই! নহিলে সত্যই ইহারা ভাল ক্রিকেট-খেলোয়াড়। জোরে ব্যাট

মারিয়া বলটা কেহ ইহাদের ধারে-কাছে আনিয়া ফেলে নাই বলিয়াই ইহাদের খেয়ালে আসে নাই যে, ক্ষিপ্রগতিতে বল ধরিবার জন্যই ইহারা অনেক কাল ধরিয়া ঐ একটা অঞ্চলে বসিয়া বসিয়া কালহরণ করিতেছে। আমার কথিত এই দৃষ্টান্তটী যে কত সত্য, তাহা তোমরা অন্বেষণ-কার্য্যে নামিয়া যাইবার পরে প্রায় প্রত্যেক স্থানেই প্রত্যক্ষ করিবে। জীবন ভরিয়া আমি এই অন্বেষণ-কার্য্যটীই ত' করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং উপরে যাহা লিখিতেছি, তাহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

একদল লোক তোমরা যখন আন্দোলন চালাইয়া যাইবে, তখন অপর একদল তোমাদের আন্দোলনের পিছে পিছে স্নিগ্ধ-পদসঞ্চারে নীরবে চলিতে থাকিবে এই সকল মানুষ-রতনদের আবিষ্কার করিবার জন্য। এসব মানুষ-রত্নেরা হৈ-চৈ ভালবাসে না কিন্তু কাজ করে। কাজ করে ইহারা নামযশের লোভ ছাড়িয়া, অকপট চিত্তে এবং অনুদ্বিগ্ন মনে। কাজ করে ইহারা বিশ্বস্ততার সহিত, দীর্ঘকাল ধরিয়া এবং পুরস্কারের প্রত্যাশা না রাখিয়া। অন্তরের ভালবাসা ইহাদের কর্ম্মের নিয়ামক, সংসারের কোনও লাভ-লোকসানের খতিয়ান ইহারা রাখে না।

ইহাদের নিকট যাইতে হইলে তোমাদিগকেও এইরূপই হইতে হইবে। তোমার ভিতরে স্বার্থগত লালসা থাকিলে তুমি ইহাদের উত্তম সাত্ত্বিকতাকে তোমার কুসংসর্গ দিয়া পঙ্কিলই করিবে, ইহাদের কাছ হইতে পুরা কাজটুকু আদায় করিতে পারিবে না। জীবন

ভরিয়া কত সেবক দেখিলাম। মুখে বড় বড় কথার অন্ত নাই, কিন্তু একটী সিকি পয়সার লাভ-সম্ভাবনা দেখিলে অনায়াসে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুত তালে চলিয়া যাইতে লজ্জা, কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করে না। কাজ যদি করিতে বা করাইতে হয়, তবে লাভলোভী দুর্ব্বলচেতার উপর হইতে ভরসা তুলিয়া আনিয়া কাজের হিসাব করিতে হইবে। গায়ে পড়িয়া বা স্পষ্ট করিয়া অকর্ম্মণ্য এই সকল লোককে কটু কথা কহিলে না, ইহা তোমার সৌজন্য বা ভদ্রতা। সুজন বা ভদ্র থাকা নিশ্চয়ই ভাল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
শনিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৩৭৪
(২৬-৮-৬৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সাধনা কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে মঙ্গল-সাগরের জলের অবস্থা দেখিবার জন্য। মরুভূমির দেশে জল যেন থৈ থৈ করিতেছে। নদীর প্লাবনের জল নহে, উপরের গ্রামগুলির ক্ষেত-চুয়ান অতিরিক্ত জল, যাহার চলিয়া যাইবার রাস্তাটাকে আমি

বাঁধিয়া ফেলিয়া জলকে আটক করিয়াছি। তিন দিন ধরিয়া সাধনা নৌকায় চড়িয়া চড়িয়া মঙ্গল-সাগরের সকল প্রান্তে ভরা-বর্ষার দারুণ স্রোতের মুখে কেমন অবস্থা কোথায় হইয়াছে, তাহা দেখিবে।

তুমিও জানিতে চাহিয়াছ আশ্রমের বিবরণ। অন্যান্যকে এই সময়ে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহারই অংশবিশেষ নিম্নে পুরুদ্ধার করিতেছি।

প্রায় ছয় কি সাত বিঘা বড় একখানা নূতন ধান্যক্ষেত্র নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে এবং এবারইতাহাতে ধান দিলাম। নাম দিয়াছি অরবিন্দক্ষেত। দুই তিন বৎসর পরে ইহা প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত হইবে। প্রায় দশ বিঘা পরিমিত আর একখানা ক্ষেত্র ধরা হইয়াছে। দেখি, কাজ করিতে করিতে কয় বৎসরে ইহা শেষ হয়। কাটিতেছি শুধু পাথর আর কাঁকর কিন্তু মাটিটা রাস্তা-নির্ম্মাণে লাগিতেছে। অরবিন্দব্রীজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। উপরের পুরু ঢালাই স্ল্যাবটা বাকী আছে। নগেশ-ব্রীজ প্রায় সম্পূর্ণ কিন্তু অসম্পূর্ণ অংশ শেষ করিতে হইবে এবং তার উপরে পুরু স্লাব ঢালাই করা বাকী আছে। এই ব্রীজটী অরবিন্দ ব্রীজ অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক পোক্ত। ইহার অধিকাংশই কংক্রিটে করা, ইটের কাজ অতি অল্পই আছে।

বিশাল ভারত-সীমান্ত লইয়া দিল্লীর ভারত-কর্ণধারদের যেমন উদ্বেগের অন্ত নাই, পুপুন্‌কীতে আমার অবস্থা কতকটা সেই

রকম। একস্থানে একটা গৃহ-নির্ম্মাণ করা সুরু করিলাম, হঠাৎ অন্য সীমান্তে এক দারুণ গোলযোগ আসিল। ছুটিতে হইল সেখানে ছাড়-দেওয়াল গাঁতিতে। বারোটা বৎসর ধরিয়া কি যে নাস্তানাবুদ হইতেছি, বলিবার নহে। এই কারণেই একটা একটা করিয়া ইমারত শেষ করিয়া পর পর অন্য ইমারত ধরা যায় নাই। কিন্তু তিনশত বিঘা জমি জুড়িয়া এখানে সেখানে এত কাজ এমন ভাবে হইয়াছিল ও হইতেছে যে, যে-কোনও স্থানে আর কিছু টাকা করিয়া খরচ করিলেই এক একটা নূতন সুশোভন দৃশ্যের উদ্‌ঘাটন হইবে। পরিকল্পনা সুচিন্তিত বলিয়াই এভাবে কাজ করা সম্ভব হইয়াছে এবং কোথাও কিছু একটা করিয়া অপব্যয় হইয়া গেল বলিয়া মনে করিবার কারণ ঘটে নাই। তবে প্ল্যান বুঝিতে হইলে বুদ্ধির প্রয়োজন হইবে। তিল তিল করিয়া শ্রম করিয়া বরুণ-দেবতাকে শাসনে আনিয়াছি, এখন প্রাণপণ করিয়া শ্রম করিতে পারিলে ভূমিলক্ষ্মীও অন্নদায়িনী হইবেন। ক্ষেত্র বাড়িতেছে সুপ্রশস্ত রাস্তার জন্ম দিয়া, জলাধারে জল বাড়িতেছে, ঐ রাস্তাকে প্রশস্ততর ও উচ্চতর করিয়া এবং ক্ষেত্রগুলিকে অর্থব্যয় করিয়া জল-সিঞ্চনের দায় হইতে চির-মুক্তি দিয়া। কিন্তু দেশটা পাথরে বোঝাই। প্রতি ষোলভাগ মাটিতে এক ভাগ করিয়া পাথর বাহির হইতেছে। তাহার বারো আনাই নিকৃষ্ট পাথর, যাহা দ্বারা গাঁথুনি চলে না, বাকী সিকি অংশ শক্ত পাথর। এই শক্ত পাথরগুলি আলাদা করিয়া সঞ্চয় করিতেছি এবং যেখানে যেখানে দেওয়াল

বা ইমারৎ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইতেছে, তার তলদেশে ভিত্তি পিটাইবার কাজে লাগাইতেছি। তুচ্ছকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি না, তুচ্ছকে কোনও-না-কোনও প্রয়োজনে লাগাইয়া যাইতেছি। মঙ্গলসাগরের জলের উচ্চতা দুই ফুট বৃদ্ধি সামান্য কথা নহে। মঙ্গল-সাগরের দৈর্ঘ্য পুরা সাড়ে তিন ফার্লং অর্থাৎ অর্দ্ধ মাইলের সামান্য কম। জলের উচ্চতা বৃদ্ধি করিতে পাথরগুলি আমার কাজে আসিয়াছে। আরও কিছু পাথর তথা সিমেণ্ট খরচ করিতে পারিলে জলের উচ্চতা আরও আড়াই ফুট বাড়াইতে পারিব। আর তাহা হইলে প্রস্তুত এবং প্রস্তাবিত অনেক ধান্যক্ষেত্রেই বিনা পাম্পে স্বাভাবিক ভাবে বর্ষার জল গড়াইয়া পড়িবে। তবে, জলের উচ্চতা আরও বর্দ্ধিত করিবার আগে আমাকে ধারাবাহিক বর্ষণের ফলে দারুণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে অতিরিক্ত জলগুলি বাহির করিয়া দিবার জন্য পূর্ব্বদিকে আরও একটী এবং সম্ভব হইলে পশ্চিমদিকে একটী জল-নিকাশী খাল খনন করিতে হইতে পারে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব দিক দিয়া মঙ্গলকুটীরের নীচে দিয়া যে দুইটী, ঈশান কোণে অন্নঘরের কাছ দিয়া যে একটী এবং উত্তর দিকে মমতা-ব্রীজের নীচ দিয়া যে একটী জল-নির্গমের পথ আছে, নিরাপত্তার বিচারে সেই চারিটির যথেষ্ট নহে বলিয়া আমার মনে হয়। এজন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক দিয়া আরও দুইটী জলনির্গম-পথ সুনির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে জলের উচ্চতা আরও বাড়ানোর মত নিদারুণ কাজে হাত দিব না। জলনির্গমনের রাস্তা

করিবার জন্য বর্ত্তমানের এই সাময়িক ব্যয়গুলি ভবিষ্যতের স্থায়ী ব্যয় কমাইয়া দিবে। জলের উচ্চতাবৃদ্ধির সদ্যঃ সুফল ত' এই হইয়াছে যে, নগেশ-ব্রীজের সংলগ্ন স্থানে হাজার খানিক টাকার মাটি শুধু ভরাট করিয়া দিতে পারিলেই দুই তিন বিঘা পরিমিত প্রথম শ্রেণীর ধান-ক্ষেত্র বাহির হইয়া যাইবে, যাহার ফলন প্রথম বৎসর হইতেই সুপ্রচুর হইবে। জলের অভাবেই ত' মিশর মরুভূমি, জলের প্রাচুর্য্যের দরুণই ত' পূর্ব্ববঙ্গ স্বর্ণপ্রসূ।

এবার এখানকার কাজ এত বেশী হইয়াছে যে, হয়ত পাঁচ বৎসরেও এতটা হইত না, যদি জিদ না করিতাম যে ক্ষুধার্ত্ত নরনারীদিগকে যেকোনও প্রকারে দুমুঠা অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিবই দিব। ব্রিক্‌ফিল্ড করিব বলিয়া যে কয়টা ফিকসড্ ডিপজিট করিয়াছিলাম, সব মাটিকাটার পেটে দিয়াছি। নূতন ট্রাক খরিদ করিব বলিয়া যাহা কিছু রাখিয়াছিলাম সব বেপরোয়া হইয়া মাটিতে ঢালিয়াছি। নিজের ব্যক্তিগত জিনিষপত্রের মধ্যে ঘড়ি ও চশমা ছাড়া আর যাহা-কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল, বে বিক্রী করিয়া দিয়াছি। যেখান হইতে যাহা সংগ্রহ সম্ভব, সব ঐ ক্ষুধার্ত্ত জঠরগুলির দিকে তাকাইয়া অকাতরে ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও কি তকছু হইত, যদি সময়-মত তোমরা অনেকে আসিয়া আমার পিছনে না দাঁড়াতিতে? সেই সেনাপতি মিথ্যা, যাহার সৈন্যরা যুদ্ধ করে না, দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে।

কর্ম্মী এবং ভক্তিমান্ শিষ্য লাভ করা গুরুর পক্ষে ভাগ্যের কথা। গুরু হয়ত নির্লোভ হইতে পারেন কিন্তু যোগ্য শিষ্য চাহিবেন না এত নির্লিপ্ত কদাচ হইতে পারেন না। শিষ্যগুলি অপদার্থ অকর্ম্মণ্য জাপানী ফানুস হইলে গুরুর গুরুত্ব অসার্থক হয়। তোমাদের শক্তি অল্প, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশেই ত' অতীব দরিদ্র, তথাপি যে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলে, এজন্য আনন্দ করিব নাত' কি করিব?

তোমাদের ভিতরে আমি আজ চাহি অনমনীয় চরিত্র-বলের প্রতিষ্ঠা। আদর্শের সেবা চিত্তচঞ্চল ব্যক্তিদের সাধ্য নহে। সহস্র বিপদ এবং ঝুঁকি মাথায় নিয়াও তোমাদের অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে মানুষের মনের তামসিক প্রবণতা দূর করিয়া দিবার কাজে। অনলস-প্রযত্নে এবং নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে তোমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এই জায়গাতেই চরিত্রবলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যকতা। আমাদের দেশে বিগত শতাব্দীতে এমন অনেক যুগন্ধর পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চরিএত্রর খ্যাতি যাঁহাদের অনন্যসাধারণ এবং যাঁহাদের চরিত্র চিন্তা করিলে নিতান্ত অধঃপতিতেরও উত্থান-লাভের পথ পরিচ্ছন্ন হয়। তেমন তেজস্বী চরিত্রের অধিকারী তোমরা শতজনে সহস্রজনে হও; সমাজের মধ্যে তোমাদের স্থিতি যেন সমগ্র সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের সূচক হয়, তোমাদের বাঁচিয়া থাকার মধ্যে এথ সার্থকতাটুকু থাকা চাই। গাঁচার কত গাঁচিতে হইবে। তোমরা যে বাঁচিয়া আছ, ইহা

তোমাদের জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হওয়া চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ বারাণসী

শনিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৭৪

(৯-৯-৬৭ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। কাজ করিবে না, শুধু কথাই কহিবে, ইহার কোনও সার্থকতা নাই। কাজ যদি কিছু করিতে পার, তবেই তোমরা বাহাদুর। কথা বলিবার লোক ত' সকল স্থানেই গণ্ডায় গণ্ডায় মিলিবে, কাজের লোক কেথায় পাইবে? প্রত্যেক গ্রামের, প্রত্যেকটী পাড়ার, প্রত্যেক কুটীরের প্রত্যেকটী কুটীরের প্রতিটি মানুষকে কাজে লাগাইয়া দিয়াছ কি? উদ্যম প্রয়োগ না করিলে শুধু যাদুমন্ত্রে তোমাদের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইবে না। আমাদের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আজ আর কোনও দ্বিমত নাই। অনেকেই শ্রদ্ধাসহকারে এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ নিতান্ত অনিচ্ছায় হইলেও ইহা মানিয়া থাকেন, যদিও ইহা মানিবার জন্য কাহারও উপরে যৌক্তিক বা দৈনিক কোনও পীড়াপীড়ি আমরা কদাচ করি নাই কিন্তু আদর্শ উচু হইলেই ত' চলিবে না, অনুশীলনও সঙ্গে

সঙ্গে চাহি। জগতের অনেক মণীষী অনেক ভাল ভাল কথা কহিয়াছেন, যাহার এক কণা দুই কণাও তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয় নাই। আদর্শের এইখানেই অপমৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে। আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখে জাগ্রত জীবন্ত কর্ম্ম। অনুশীলন-বর্জ্জিত আদর্শ গ্রন্থের সম্পদ হইতে পারে, জীবন-পথের পাথেয়ও নহে, লক্ষ্যও নহে।

কাহাকেও যখন দেখি যে, সৎকথায় অনাদর নাই কিন্তু কথার চেয়ে কাজকে বেশী মূল্য দিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে কাজের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার প্রতি অবিমিশ্র স্নেহ গভীরতম হইয়া উৎসারিত হয়। কাজের কাজীকে কি পরিমাণ ভালবাসা দিতে ইচ্ছা করে, তাহা আমি পত্র লিখিয়া অক্ষর সাজাইয়া কি ভাবে প্রকাশ করিব? কাজ তোমাদের অনন্ত ও অফুরন্ত, একজনে বা একজীবনে একাজ সম্পন্ন হইতে পারে না কিন্তু চিন্তাশক্তির বলে বিচিত্র-কর্ত্তব্য-নিচয়ের মধ্যে একটা পারম্পর্য্যের স্তর বিন্যাস করিয়া লইয়া পদ্ধতিবদ্ধ ভাবে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা সহকারে কিছুকাল কাজ করিয়া যাইবার পর দেখিতে পাইবে যে, সমগ্র জগৎ জুড়িয়া, বিরাট একটা মেশিন কেমন করিয়া জানি হঠাৎ চালু হইয়া গেল। যে সকল লোককে একদা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ বলিয়া মনে হইতেছিল, হঠাৎ দেখিতে পাইবে যে, তাহারা এক এক জনে নিজেদের অজ্ঞাতসারে এমন এক একটা মহাদায়িত্বপূর্ণ জরুরী কাজে নিজেদের ঢালিয়া দিয়াছে, যাহা পূর্ব্বে কল্পনার অতীত ছিল।

ছোটদের দ্বারাও বড় কাজ করান সম্ভব। বড়দের দ্বারা ছোট কাজ হয়ত নাও হইতে পারে, কিন্তু ছোটদের দ্বারা ছোট ছোট ভাল কাজ না হইবার কোনও কারণ নাই। বড়দের সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, তাঁহারা নিজেদিগকে বড় মনে করিয়া ছোট ছোট ভাল কাজ সম্পর্কে একটু উন্নাসিক হইয়া থাকেন। ইহা যে তাঁহাদের বড় থাকিবার বাধা, ইহা তাঁহারা বোঝেন না। প্রকৃত যে বড়, সে শিশুর মত সরল, নিরভিমান এবং সর্ব্বজনে সমদর্শী হইবে। শিশুরা মানুষ মাত্রকেই মানুষ জ্ঞান করে, বড়লোক বা ছোটলোক বলিয়া মনে করে না। তবে সম্মুখে পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন দুইটী মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিলে, পরিচ্ছন্ন মানুষটীকেই শিশুরা আগে পছন্দ করে। কিন্তু কর্ম্মীর আভরণ বা আচরণ তার পোষাক নয়, তাহার আভরণ তাহার চরিত্র। ছোট বড় তোমরা প্রত্যেকে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী হও এবং নিজ নিজ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হস্তের স্পর্শ দিয়া বিশ্বদেবতার পূজার পাত্র, পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসী ও চন্দনে হর্য-সমুৎপাদন কর।

ছোট ছোট কাজেও সফলতা লাভের জন্য তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। একক ভাবেও করিবে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেও করিবে। সৎকাজ, তাহা ছোটই হউক আর বড়ই হউক, একবার সফলতায় মণ্ডিত হইলে পরবর্ত্তী অনেক বড় কাজকে সহজে সফল করিয়া দিবার পথ সুগম করে। সৎকাজে কখনো বিফলতা আসিলেও, তাহাকে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। চেষ্টা হয়ত

বিফল হইল কিন্তু তোমার অন্তরের সত্য-চিন্তার রেখাগুলি তোমার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া গিয়া তোমাকে বৃহত্তর সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে অবিরাম সাহস, উন্নীপনা ও যোগ্যতা যোগাইতে থাকিবে। বিফলতার এই খানেই এক বিরাট সার্থকতা। হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। কাজ করিয়াই যাইতে থাক। ফলাফলের দিকে লোলুপ নেত্রে তাকাইবার প্রয়োজন নাই। সৎচেষ্টা নিজেই নিজের পুরস্কার। যদি সফলতার কনক-কিরীট লাভ হইয়া গেল, তবে তাহা অধিকন্তু হইল, উপরন্তু হইল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

মাদ্রাজ

২২শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৭৪

(৯-১০-৬৭ ইং)

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গত পরশ্ব সন্ধ্যার সময়ে আমাদের ট্রেইন যখন নাগপুরে থামিল, তখন নাগপুর-প্রবাসী তোমাদের এক গুরুভ্রাতার সহিতও কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা হইল। বহু বৎসর পূর্ব্বে ছেলেটী কুমিল্লা হইতে গিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সোনামূড়াতে তাৎকালিক সরকারী ডাক্তার নরেশ দত্তের গৃহে দীক্ষা নিয়াছিল।

দেশ-বিভাগের বিশৃঙ্খলায় ছেলেটী কোথায় যে হারাইয়া গেল, এতকাল ত' জানিতেই পারি নাই। খুব সম্প্রতি তাহার নাগপুরের ঠিকানা জানিতে পারি। নাগপুরের পথে যাতায়াত-মুখে এইবার লইয়া দ্বিতীয়বার তাহার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল। নাম তার অনিল ভূষণ মজুমদার। সে নাগপুরে একটী বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়াছে।

এই একটী দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও কেহ মাতৃভাষা ছাড়িতে পারে না, মাতৃভাষা ছাড়িতে চাহে না। এই যে না-চাওয়া, এই যে না-পারা, ইহাকে জাতিগত সঙ্কীর্ণতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে ভুল হইবে। মায়ের কোলে বসিয়া মানুষ প্রথম যে ভাষায় কথা শোনে, প্রথম যে ভাষায় কথা কহা শিখে, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইলে জন্ম-নাড়ীতে টান পড়ে। জন্ম-নাড়ীকে উৎপীড়িত করিয়া কিছু করিতে চাহিলে মনস্তাত্ত্বিক নানা সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের পক্ষে ইহা এক মারাত্মক পরিস্থিতি, যাহাদের মাতৃভাষায় বস্তু আছে, উৎকর্ষ আছে, অত্যুচ্চ চিন্তারাজির লীলাক্ষেত্র আছে। বাংলা ভাষা কেবল বাঙ্গালীরই গৌরব নহে, ইহা ভারতেরই গৌরব। বাংলা ভাষা নিখিল ভারতের গৌরব বলিয়াই ভারতের দুইটী জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা দুই বাঙ্গালী সাহিত্যিক, ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি রবীন্দ্র। অনিল নাগপুর হইতে বাংলা কাগজ বাহির করিয়া ভাল কাজই করিয়াছে। তাহার কাজ

সফল হইবে যদি তাহার কাগজ উচ্চ চিন্তা পরিবেশন করে। ভাষা বাঁচিয়া থাকে তাহার চিন্তারাজি দ্বারা, আওয়াজের দ্বারা নহে। উচ্চচিন্তা নাই বলিয়া গত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা সমাজের মধ্যে প্রচলিত কত দীর্ঘায়ু ভাষা দেখিতে না দেখিতে অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে। যে ভাষায় ভাবের সম্পদ নাই, তাহাকে রাষ্ট্রীয় সহায়তার স্যানাটোজেন এবং অত্যুগ্র উৎসাহের কোরামিন খাওয়াইয়াই যে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে, এইরূপ ধারণা একান্তই অন্ধ গোঁড়ামিরই পক্ষে সম্ভব। বেনারসে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর যাবৎ একখানা বাংলা মাসিক চলিতেছে,—"উত্তরা"। এতগুলি বছর বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহার রাষ্ট্রীয় সহায়তার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক, "উত্তরা" কি করিয়া বাঁচিয়া আছে? তাহার জীবন-ধারার মূল উৎস কি? কি সেই বস্তু, যাহা থাকিলে সে বাঁচিবেই বাঁচিবে, তাহাকে জোর করিয়া গলা টিপিয়াও মারিতে পারা যাইবে না? অবাঙ্গালীর দেশ উত্তর-প্রদেশে বসিয়া "প্রতিধ্বনি" কি করিয়া মাসে বিশ হাজার করিয়া ছাপান সম্ভব হয়, ইহাও প্রশ্ন হইতে পারে। এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, ভাবই ভাষাকে জীয়াইয়া রাখে, জোর, জবরদস্তি বা ডাণ্ডাবাজি নহে।

আজ যখন ভাষার প্রশ্ন লইয়া ভারত-রাষ্ট্র প্রতি সপাহে সাতটি করিয়া নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে এবং জোড়াতালি দিয়া

সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া নূতন সমস্যার অজানা গহ্বরে বড় বড় রাজহস্তীর গোদা পা হঠ্ করিয়া পড়িয়া যাইতেছে, সেই সময়ে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া আমি কিন্তু নিরুদ্বেগে কাজ করিয়া যাইতেছি। তাহা হইতেছে, ভাবের সম্পদই সম্পদ, ভাষার ঝণৎকার কিছুই নহে। টাকায় যদি রূপা না থাকে, মোহরে যদি সোনা না থাকে, ঝিনুকে যদি মুক্তা না থাকে, খনিতে যদি মণি না থাকে, তবে তাহার মূল্য কতটুকু, তাহার আদর কয় দিনের, তাহার প্রভাব বা প্রতিপত্তি কাহার পক্ষে হইবে লাভজনক? এই কারণেই সংস্কৃত ভাষাকে মৃত ভাষা বলিয়া গালি দিবার পরেও তাহাতে অনভিজ্ঞ থাকার মূঢ়তা স্বীকার করিতে অতি সুকৌশলী রাজনৈতিক দাবা-খেলোয়াড়ের পক্ষেও একটা অস্বস্তিকর কুণ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাব-জননী সংস্কৃত-ভাষা মৃতা হইয়াও ভারতের অধিকাংশ জীবিত ভাষাকে আজও সুপ্রচুর স্তন্যদানে সমর্থা। অবশ্য, গ্রীক বা ল্যাটিন, প্রাচীন হিব্রু প্রভৃতি যে অর্থে মৃত, সংস্কৃত সেই অর্থে মৃত নহে। এখনও ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি পরিবার রহিয়াছে, যাহাদের প্রত্যেকটী প্রাণী মাতৃভাষা রূপে সংস্কৃত ভাষাতেই দিবারাত্র কথা বলে, চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে। এখনও শত শত আঞ্চলিক ভাষার গ্রন্থ মাসে মাসে সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত হইতেছে, যাহার ফলে নিখিল ভারতের নানা ভাষাভাষী পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের মাধ্যমে এক প্রদেশে বাস করিয়াও অন্য প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে সমর্থ

হইতেছেন। এই ত' সেই দিন রবীন্দ্রনাথের বাংলা বহি "ডাকঘর" সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া সমাদৃত হইল। তোমরা অনেকেই হয়ত জান না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ বহু বৎসর পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছে।

অনিল বলিল, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ছিন্নমূল বাস্তুত্যাগী নাকি পনের হাজার আসিয়া এই নাগপুরে বসিয়াছে। আমি বলিলাম,—ইহা দুঃখের সংবাদ নহে, ইহা ভাল খবর। অবশ্য, যদি এই বাস্তুত্যাগীরা জিদ করিয়া বসে যে, তাহারা কাহারও ক্রীতদাসের মতন চলিবে না, তাহারা মানুষের মতন বাঁচিবে, মানুষের মত মাজ করিবে, মানুষের মতন জীবন-সংগ্রাম পরিচালন করিবে, আর মরিবার যদি প্রয়োজন হয়, মানুষের মত লড়াই দিতে দিতে মরিবে। মানুষের মত দৃঢ় হইয়া, সরল হইয়া, সবল পদক্ষেপে চলিবার সাহস লইয়া, অন্যায়ের নিকট মাথা নত কিছুতেই যে করা হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহাদের বাঁচিতে হইবে। আধমরা হইয়া বাঁচিয়া থাকিব না, বাঁচার মত বাঁচিতে চেষ্টা করিয়া প্রয়োজন হয় অবহেলে প্রাণ দিব,—এই সঙ্কল্প চাই। কথা বলিবার সময় পাওয়া গেল না, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, সংগঠন ত' চাই! কিন্তু সংগঠন কথাটার মানে কি? যাহারা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে এদিকে সেদিকে বিশৃঙ্খল হইয়া, তাহাদিগকে একটা ঐক্যের সূত্রে বাঁধিয়া নির্দ্দিষ্ট একটা আদর্শানুসারী ভাবধারায় যুক্ত করিয়া অচলায়াতনকে

সচল করিবার সফল চেষ্টার নাম সংগঠন। এ চেষ্টা একদিনেই সফল হয় না, এমন কি কখনো কখনো বিফলতাও বরণ করিতে হইতে পারে, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হইল চেষ্টার ধারাবাহিকতা। একবার যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে, শ্মশান-চুল্লী জ্বলিবার আগ পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা ছাড়িব না, এই পণ চাই। যে যেখানে আছ বিপন্ন বা বিষণ্ণ, সকলকে ডাকিয়া বলিতে চাহি, তোমরা প্রযত্নপর, এইটুকুই কিন্তু যথেষ্ট নহে, তোমাদের চেষ্টা হওয়া চাই একাগ্র, উদগ্র, নির্ভীক ও সবল, তোমাদের চেষ্টা হওয়া চাই অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত অবিরল, অলোপনীয় এবং ধারাবাহিক। তাহারই নাম সংগঠন।

ঐক্যই সংগঠনকে শক্তিশালী করে। একা একা কতটুকু কাজ হয়? কথায় বলে,—একা বৃহস্পতি মিথ্যা। একাকীই যদি পড়িয়া গিয়া থাক, তবে সঙ্গী, সাথী, সহায়ক দ্রুত খুঁজিয়া বাহির কর, ফলে একজন যখন ক্লান্ত ও বিশ্রামকাতর, তখন অন্য দশ জনে যেন কাজটাকে চালু রাখিতে পারে। ঘটোৎকচ মহাবলশালী যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা সকলকে মিলিয়াই করিতে হইয়াছিল। একা অভিমন্যু, একা অর্জ্জুন, একা ভীম, একা সাত্যকি বা একা ধৃষ্টদ্যুম্ন এত বড় লড়াইটা জিতিতে পারিতেন না। সংগঠনকে শক্তিশালী করিতে হইলে সহকর্ম্মী নিশ্চয়ই বাড়াইতে হইবে। কিন্তু সংঘকে যদি বাড়াও, সৎলোক দিয়া বাড়াও। চরিত্রহীন, অস্থিরমতি, দুর্ব্বলচেতা, অসত্যাচারী, কপটীর দল দিয়া সংগঠন হয় না,—হয় হুজুগ।

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া স্থিরবুদ্ধিতে যাহারা কাজ করে, তাহারা অনেক দ্রুত এবং অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। প্রতিহিংসা, আক্রোশ আর বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা কাজ করে, তাহাদের কাজের দ্রুততা অনেক সময়েই অস্বাভাবিক কিন্তু সেই কার্য্যের কর্ম্মফলের দীর্ঘস্থায়িত্ব অত্যল্প, সেই কার্য্যের ব্যাপক প্রভাবের পরিমাণ নিতান্তই তুচ্ছ!

সহকর্ম্মীকে সৎ, মহৎ ও বড় হইবার সহায়তা করিয়া নিজে বড় হইবার পথ ধরিয়া চল। চালাকি করিয়া বা কৌশলের দ্বারা মহত্ত্ব অর্জ্জন করা যাইবে না। অপকৌশল অবলম্বন করিয়া যাহারা বড় হয়, তাহারা চিরকাল ছোটই থাকিয়া যায়।

মানুষ হইবার জন্য আগে চেষ্টা কর। মানুষেরই বাঁচিয়া থাকায় জগতের লাভ, অমানুষেরা বাঁচিয়া থাকিয়া জগৎকে কোন্ দিক দিয়া লাভবান্ করিবে? তাহারা ধরণীর ভারই মাত্র বাড়াইবে, তাহারা বসুন্ধরাকে অতি দ্রুত শূন্য ও রিক্ত করিয়া দিবারই সহায়তা করিবে।

মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই কেহ অসাধারণ হয় না। অথবা আরও সত্য করিয়া বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয় যে, দুই একজন মানুষ ছাড়া অপর সকল মানুষই জন্মকালে নিতান্ত নগণ্য ও সাধারণ প্রতিভাত হয়। জগতে যে সকল ব্যক্তি অসামান্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, পূজিত ও বন্দিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর সকলেই নিতান্ত সাধারণ পরিস্থিতিপুঞ্জের মধ্য দিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। যে দুই একজনের আবির্ভাব-কালীন

ঘটনানিচয়ের সাড়ম্বর বর্ণনা আমরা পাইয়া থাকি, তাঁহাদেরও মধ্যে অনেকেরই সম্পর্কিত বর্ণনাগুলি afterthought বা পরবর্ত্তী কালে রচিত অলীক কাহিনী মাত্র। অধিকাংশকেই যখন মায়ের পেট হইতে সাধারণের মত পড়িতে হয়, তখন তোমরা জীবন-কর্ম্ম আরম্ভকালে সাধারণ কর্ম্মীই রহিয়াছ বলিয়া তোমাদের আফশোষ করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কারণ, তোমরা যদি নিজেদিগকে অতি সামান্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, নগণ্যাধম বলিয়া গণনা না করিয়া ঈশ্বরদত্ত শক্তিটুকুর সদ্ব্যবহারে লাগিয়া যাও, তোমরা যদি পরিপূর্ণ সেবাবুদ্ধি লইয়া নিজ নিজ কাজে লাগিয়াই থাক, তবে দীর্ঘকাল পরে হইলেও একদিন দেখিতে পাইবে, তোমাদের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরও কত সাধারণ কর্ম্মী দেশ, জাতি ও জগৎকে আমৃত্যু নিঃস্বার্থ সেবা দিয়া ধন্য হইবার জন্য আবেগাকুল চিত্তে আগ্রহকম্পিত চরণে দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতে থাকিবে। তখন দেখিবে, এই একটীমাত্র ঘটনার জন্যই সাধারণ তোমরা প্রতিজনে অসাধারণ হইয়া গিয়াছ। জন্মমাত্রই কাহারও অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, সাধারণ লোকেরাই সুদীর্ঘপ্রযত্নে মহৎ লক্ষ্যে কাজ করিতে করিতে সংঘকে শক্তিশালী করিবার সঙ্গে-সঙ্গে, দেশকে উন্নতিশীল করিবার সঙ্গে সঙ্গে, জাতিকে সঙ্গতিসম্পন্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজকে বিশ্বালিঙ্গনকারী উদার করিবার সঙ্গে সঙ্গে, জগৎকে পরমলাভে লাভবান করিবার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ হয়।

আমার পত্রগুলির মধ্যে যে সকল উপদেশ নিহিত আছে, তাহা নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিও। আমি যেই বিষয়ে বাহ্যতঃ তোমাদিগকে যতটুকু বলিলাম, সেইটুকুতেই আমার উপদেশ শেষ হইয়া গেল না। একটু গভীর ভাবে ভাবিলেই দেখিবে, একটী সাধারণ কথার আড়ালে অনেক অসাধারণ তাৎপর্য্য লুকাইয়া আছে। অনুশীলন-বিহনে সেই তাৎপর্য্য ঠিক ঠিক ধরা পড়ে না। বিজ্ঞানের রসশালায় গবেষণা করিতে করিতে যেমন অনেক জানা জিনিষের অজানা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অনুশীলনের গবেষণাগারে তেমনি অনেক জানা উপদেশের অজানা তরৎপর্য্য ধরা পড়ে। রেলওয়ে টাইমটেবলের পাতায় ষ্টেশনের পরে ষ্টেশনের নাম পড়িয়া গেলেই যেমন ষ্টেশানগুলির চেহারা মালুম হয় না, পরন্তু টিকিট কাটিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিলে ট্রেণ চলার সাথে সাথে নিত্য নূতন দৃশ্যের উদ্ঘাটন হইতে থাকে, উপদেশ সম্পর্কেও ব্যাপারটা তদ্রূপ। উপদেশকে নিজ জীবনে যতই অনুশীলন করিবে, ততই তাহার ফলিতার্থ প্রকটতর হইতে থাকিবে। আমি উপদেশ দিতে পারি কিন্তু তাহা পালন করিতে হইবে তোমাদিগকেই। আমার উপদেশ আমি নিজে পালন করিলে তাহাতে আমার পূরা লাভ,— তাহাতে তোমাদের লাভ কতটুকু? কিন্তু তোমরা পালন করিলে পূরা লাভটুকু তোমাদের,—আমার লাভের মধ্যে একটুখানি ফাও মাত্র থাকিতে পারে। অবশ্য, আমিই লাভবান্ হই আর তোমরাই লাভবান্ হও, জগতের যে-কোনও

একটী প্রাণী লাভবান্ হইলে জগৎ লাভবান্ হইল, এই সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ

ওয়ালটেয়ার (অন্ধ্র)

রবিবার, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৭৪

(২২-১০-৬৭ ইং)

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা নানা স্থান ঘুরিয়া আমার নিকটে পৌছিয়াছে। এজন্য উত্তর দিতে দেরী হইল। একথা সত্য যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উদরের ক্ষুধা কেহ কদাচ দূর করিতে পারিবেন না। তথাপি অপরকে ক্ষুধাক্লিষ্ট দেখিলে নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকদের মনে তাহাকে সহায়তা করিয়া রক্ষা করার চেষ্টা নিতান্তই মনুষ্য-স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার। এক পশু অপর পশুর ক্ষুধা দেখিলে কি করে, উচ্চস্তরের মনস্তাত্ত্বিকেরা তাহা নিয়া গবেষণা করিতেছেন। নিজ অপত্য নহে বা জীবন-সঙ্গী নহে, এমন পশুকে অপর পশু এভাবে সাহায্য করে কি না, তাহা গবেষণার বিষয়। কিন্তু মানুষ তাহা করে। সকল ক্ষেত্রে করে না, অনেক ক্ষেত্রে করে। আত্মৌপম্যের দ্বারা মানুষ ইহা করিতে

প্রণোদিত হয়। এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব বা ইহা তাহার মনুষ্যত্বের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিকাশ। মানুষের দুঃখে মানুষ কাঁদিলেই তাহা স্বাভাবিক হয়, না কাঁদিলেই তাহা অস্বাভাবিক। আমাদের প্রত্যেককে মানুষ হইতে হইবে।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুঃখ দেখিয়া মানবমিত্র বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ বিক্রয় করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি মানুষের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ছিলেন। এমন লোকোত্তর চরিত্র পুরুষের পক্ষে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। তাঁহার এই গভীর মানবপ্রেমিকতা তাঁহার চরিত্রের এমন একটা দিককে অবগুণ্ঠনমুক্ত করিয়াছে, যেই দিকটা না দেখিলে আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারিতাম না। এমন মহামানবদের পদাঙ্ক যে আমরা অনুসরণ করিতে শিখিলাম না, ইহাই ত' আমাদের জাতির চরম দুর্ভাগ্য এবং ইহাই আমাদের উপরে যুগ-বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস।

একটী লোক কোথাও দুর্ভিক্ষে মরিলে সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের লোকের মনে এমন এক আতঙ্ক আসিয়া যায়, যাহার ফলে অল্পাহারেও যাহারা বেশ কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, তাহারাও মনের দুশ্চিন্তায় অনেক আগে মরিয়া যায়। ইহার অপর কুফল এই যে, নিজেরা বাঁচিবার জন্য অসঙ্গত সঞ্চয় এতদিন যাহাদের ভিতরে ছিল না, তাহারাও হঠাৎ অনুচিত সঞ্চয়ে মন দেয়। তাহাতে দুর্ভিক্ষ আরও বাড়িয়া যায়। এই জন্যই প্রথম মৃত্যুটীকে নিবারণ করা এই সকল স্থলে সব চেয়ে বড় কথা।

আমি যে পুপুন্‌কীর দুর্ভিক্ষাবস্থা দর্শনে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলাম,—কেহ কেহ তখন আমাকে একেবারে বদ্ধপাগল বলিয়াও হয়ত মনে করিয়াছে,— তাহার কারণ আর কিছুই নহে। তোমাদের ত্যাগে, অযাচক আশ্রমের ত্যাগে এবং আমাদের সাধ্যমত ব্যক্তিগত পরিশ্রমে যে এই নিদারুণ দুর্ঘটনার কালটা কোন অপমৃত্যু না ঘটিয়াই কাটিয়া গেল, একথা ভাবিতে এখন বড়ই স্বস্তিবোধ হইতেছে। কিন্তু অলসের দুর্ভাগ্য কদাচ দূর হয় না। অলসের দুর্ভিক্ষ চিরকাল থাকে। চোরকে যাহারা সামাজিক দণ্ড না দিয়া ধনলাভহেতু প্রকাশ্যে সম্মানিত করে, তাহাদের দেশের দুর্ভিক্ষ কদাচ দূর হয় না। যাহারা ধার না করিয়া জীবন-যাপনের প্রণালীকে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করে না, দুর্ভিক্ষ তাহাদের গৃহ কদাচ ছাড়ে না। যাহারা নিজের ঘরের সম্মুখের প্রতি কণা মৃত্তিকাকে শস্যোৎপাদনের কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকে না, তাহাদের দুর্ভিক্ষ কদাচ যায় না। এক একটী দুর্ভিক্ষ আসিতেছে কিন্তু কেন এই দুর্ভিক্ষ হইল, তাহার কথা কি কেহ চিন্তা করিল? না খাইয়া দলে দলে মানুষ মরা আর রাস্তার ধারের কুক্কুর-শাবকের মরিয়া থাকা কি মানব-জীবনের ইতিহাসে সমপর্য্যায়ের ঘটনা হইবে? ইন্দুরে তোমাদের শস্য খায়, প্রতীকার কর না। বানরে তোমাদের সব্জীবাগান লণ্ড-ভণ্ড করে, ধর্ম্মীয় বিচারে বানর ধরিবে না, হনুমান মারিবে না। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দুনিয়ার যত চোরকে দেশের শস্যরাশি লুকাইয়া রাখিয়া

কালো টাকা উপায় করিবার সাহায্য করিবেন কিন্তু মানুষের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-মর্য্যাদা, খাতির তারিফ কিছুই কমিবে না। ইহাই যেখানে দেশের অবস্থা, সেখানে দুর্ভিক্ষ নিবারণের সহজ সদুপায় কি হইতে পারে?

দুর্ভিক্ষ দমন করিতে হইলে প্রচুর ফলন যেমন আবশ্যক, খাদ্য বস্তুর সুসঙ্গত বণ্টনও তেমন আবশ্যক। খাদ্যবস্তুর বণ্টন-ব্যবস্থার ভার রাষ্ট্রে নিতে হয়, কিন্তু মানুষের বিবেক নিষ্কলঙ্ক ও চরিত্র শুভ্র না হইলে রাষ্ট্র নামক যন্ত্র বেশী কাজ করিতে পারে না। প্রচুর ফলন সম্ভব করিতে হইলে মৃত্তিকায় সার থাকা চাই। রাসায়নিক সার প্রয়োগের রেওয়াজ যে ভবিষ্যতে ভারতের মৃত্তিকাকে পাইকারী হারে বন্ধ্যাত্ব দিবে, এই বিষয়ে এখনো কোনো বিজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্টই হয় নাই। গোবরসারই যে প্রচুর ফলনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সুষম সার, ইহাও দেশবাসীরা ভুলিয়া যাইতেছে। কৃষি সহায়ক পশুপালন যে দুগ্ধ-সমস্যা ও অন্নসমস্যা উভয় সমস্যারই সমাধান, এই কথাটীকে যোগ্য সম্মান কোথাও দেওয়া হইতেছে না। সব ব্যাপারে ঠিকাদারী মনোবৃত্তি নিয়া কাজ চলিতেছে। আখেরে কি হইবে, তাহার দিকে দৃষ্টি না দিয়া সকলে মিলিয়া কেবল সাময়িক লাভের অঙ্ক কষিতেছে। এভাবে দুর্ভিক্ষ দমন হয় না।

জনসংখ্যা কমাইলেই খাদ্য সুলভ হইবে, দুর্ভিক্ষ দূর হইবে, —ইহাও সত্য নহে। জনসংখ্যা যেন কমিল কিন্তু চুরি করিয়া

খাদ্য নেপালে, পাকিস্থানে, সিংহলে বা ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করিয়া সেই টাকায় যাহারা মদ ও মেয়ে মানুষের পূজা করে, তাহারা ত' কমিবে না! দেশে লোকের মোটর গাড়ীর সংখ্যা বাড়িবে, অনেকের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ফাঁপিয়া উঠিবে কিন্তু চেষ্টা-করিয়া-সংখ্যা-কমান অল্প লোকগুলি অনেকেই পেটভরিয়া খাইতে পাইবে না।

জনসংখ্যা কমিবার জন্য যে উপায় প্রচারিত হইতেছে, তাহা সদুপায় নহে। জনসংখ্যা কমিতে পারে ব্যাপক সংযমে, যাহার দরুণ অস্বাভাবিক-মানসিকতা-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতে পারিবে না। এই যে কৃত্রিম উপায়ে জনসংখ্যা কমাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে সমীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, সংশ্লিষ্ট মাতা ও পিতাদের ভিতরে মনোবিকলনের প্রাচুর্য্য কিরূপ দ্রুত বেগে ঘটিতেছে। অস্বাভাবিক পথে পাদচারণা করিতে গিয়া ইহারা নিজ নিজ সন্তানদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতেছে, —যাহা সমগ্র বংশের পক্ষে ক্ষতিকর। আর যে শান্তির জন্য সুখের জন্য সন্তান-সংখ্যা কমাইবার চেষ্টায় মানুষের স্তর হইতে ইহারা নামিয়া গিয়াছিল, সেই সুখ বা সেই শান্তি কখনো সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। কারণ, রুগ্ন মানসিকতা-সম্পন্ন (neorotic) স্বামী ও পত্নী কদাচ নিজেদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য (adustment) স্থাপন করিয়া চলিতে পারে না।

জনসংখ্যা কমাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় যুদ্ধ। যুদ্ধ যখন মহৎ

উদ্দেশ্যে হয়, তখন তাহাকে শ্রীকৃষ্ণও নিন্দা করেন নাই। যুদ্ধ যখন হেয় উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত, তখনই তাহা নিন্দনীয়। যে জাতির বা যে নেতার যুদ্ধভীতি থাকে, তাহারা বিনাযুদ্ধে স্বদেশের মাটি বিদেশের পদভারে লাঞ্ছিত হইতে দেয়। যুদ্ধভীতি দূর করিবার জন্যও দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। যে দেশের প্রতিটি মানুষের একটী ভোট্ এবং গুণাগুণ-বিচারহীন সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যে দেশের রাষ্ট্রীয় ভাগ্যের নিয়ন্ত্রিকা, সে দেশে কোনও সম্প্রদায়-বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই যদি নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা ধারাবাহিক ভাবে চালাইয়া যাইতে থাকে, তাহার প্রতীকার কি, একথা কেহ ভাবে নাই।

অল্পকিছু লোকের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিয়া যেই পন্থা গৃহীত হয়, তাহা হয়ত সমগ্র জাতিকে ব্যাপক কুশল প্রদাননাও করিতে পারে। সুতরাং হঠাৎ-বিজ্ঞ সুযোগ-সন্ধানীদের প্রদত্ত উপদশে পালন করিতে যাইবার আগে একটীবার আমাদের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন এবং জানিয়া নেওয়া সঙ্গত যে, আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা এই সকল বিষয়ে কি ভাবিয়াছিলেন। আমাদের যদি গৌরব করিবার মতন অতীত কিছু না থাকিত, তাহা হইলে এইটুকুর প্রয়োজন হইত না।

প্রত্যেকটী সমস্যার মীমাংসার জন্য আমাদের যে সর্ব্বা-লিঙ্গনকারী প্রেম চাই, এই কথাটী নিমেষের জন্যও ভুলিওনা। সদুদ্দেশ্যের সহিত প্রেম যুক্ত হইলে কর্ম্মপন্থা-নির্ণয়ে ভ্রমের

সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কারণ, আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান যে সকল সমস্যার অতলে প্রবশে করিতে পারে না, প্রেম অনেক সময়ে সেখানকার গভীর রহস্য সহজাত সংস্কারের ন্যায় প্রকাশ করিয়া ধরে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

শিলচর হইতে কলিকাতা
আসিতে বিমানে
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪
(১৫-১২-৬৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

'ফোকার ফ্রেণ্ডশিপ' বিমানে এইটাই বিশেষ সুবিধা যে, দরকার হইলে চিঠিলেখা যায়। প্রথম সময়টা শারীরিক ক্লান্তহেতু ঘুমাইয়া লইয়াছি। আগরতলার পরে লেখনী ধরিলাম।

আগরতলায় বিমান বিশ মিনিট থামে। আশা করিয়াছিলাম যে, নামিয়া সমাগত সকলকে কয়েকটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিব। কিন্তু প্রণামার্থী ভক্তদের উদ্দাম শৃঙ্খলাহীনতা তাহা করিতে দিল না। ঠেলাঠেলিতেই সময়টুকু নষ্ট হইয়া গেল। আমার কিছু

বক্তব্য থাকিলে সেটুকু বলা পর্য্যন্ত সকলের যে শান্তভাবে অবস্থান প্রয়োজন, এই কথাটী কোথাও কাহারও মনে জাগে না কেন?

বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, কাছাড় জাগিয়াছে। ত্রিপুরা জাগরণের মুখে কাছাড় একটী সর্ব্বাত্মক পরিকল্পনা করিয়া তারপরে কাজে নামিয়াছে। অর্থাৎ জেলার প্রতিটি উল্লেখযোগ্য স্থানের সহিত যোগাযোগ করিয়া কাছাড় কাজ করিতেছে। ত্রিপুরায় তাহা হয় নাই। ত্রিপুরায় পরিকল্পনাকার কেহ নাই। স্থানীয় উদ্যমে সীমাবদ্ধ কতকটুকু স্থানে এক এক জন একটু একটু কাজ ধরিয়াছে। ইহা জাগরণ নহে, জাগরণের পূর্ব্ববর্ত্তী হাত-পা-গায়ের মোচড় মাত্র। আমি চাহি ত্রিপুরায় পূর্ণ জাগরণ আসুক এবং কাছাড়ের যেন আবার ঘুম পাইয়া না বসে।

"সে জাগা জাগিতে চাই,
যাহাতে বিরাম নাই,"।

কথাটা তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করুক।

তোমাদের জাগৃতি বিশ্বজনের সর্ব্বতোমুখ কুশলের জন্য, কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতি, নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, নির্দ্দিষ্ট দেশবাসী, নির্দ্দিষ্ট ভাষাভাষি, নির্দ্দিষ্ট সংস্কারাশ্রয়ী বা নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের আশ্রিতদের জন্য নহে। তোমাদের জাগরণ বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, আস্তিক, নাস্তিক দেবতা ও অসুর সকলের জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ বারাণসী হইতে কলিকাতার পথে ট্রেণে
৭ই পৌষ, ১৩৭৪
(২৩-১২-৬৭)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নির্দ্দোষ নির্ম্মল যার মন
কিছুতে নাহিক তার ভয়,
আদর্শের ধ্যান অনুক্ষণ
পথ-বাধা করে তা জয়।
উদ্দাম অবাধ গতি নিয়া
পরমেশে প্রাণ সমর্পিয়া
চলে সে কর্ত্তব্য-পথ বাহি'
নিরন্তর নির্ভীক্-হৃদয়।
অচঞ্চল প্রতিজ্ঞার বলে
স্থির লক্ষ্যে নিজ পথে চলে,
প্রলোভনে কভু নাহি টলে,
তুচ্ছ করে বিঘ্ন-সমুদয়।
সবারে দেখাতে সত্য পথ
সযত্নে চালায় নিজ রথ,
সকলের সাথে যেথা যোগ
সেখানে নিজেরে করে লয়।

অমৃতত্ব তাহারি লাগিয়া
নামে ভূমে মুরতি ধরিয়া,
সে-ই লভে দিব্য সুখরাশি
অনুভূতি নিত্যানন্দময়,
জীবনের স্নিগ্ধ আস্বাদন
তারি লভ্য, অন্য কারো নয়।

ট্রেণে বসিয়া পত্র লিখিলে লেখা হয় খারাপ, তোমার হয়ত বুঝিতে কষ্ট হইবে। বেশীক্ষণ লেখা যাইবে না।

আজ ডুন এক্‌স্‌প্রেস সাড়ে তিন ঘণ্টা লেইট চলিয়াছে। আসানসোলে লেখনী ধরিয়াছি। হাওড়া তক্ যাইতে যাইতে যত জনকে পারি, পত্র লিখিব। ত্রিপুরা ও কাছাড় ভ্রমণকালীন অনবসর ব্যস্ততার মধ্যেও তেইশটী দিন পত্র অনেককেই লিখিয়াছি কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অনুলিপি রাখা হয় নাই। সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি "অখণ্ড-সমাচারে" পাইবে। তাহা হইতে তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ খুঁজিয়া নিও।

জীবন একটী সংগ্রাম। সংগ্রামকে অস্বীকার করা আর জীবনকে অস্বীকার করা এক কথা। সংগ্রামের ভয়ে সংসার ছাড়িয়া যাওয়া আর নিজেকে বঞ্চনা করা সমান কথা। সংগ্রামভীত দুর্ব্বলেরা দলে দলে কত কত আশ্রম ভরিয়া ফেলিয়াছে, ফলে আশ্রমগুলি নিজেদের কৌলিন্য এবং উপযোগিতা হারাইতেছে। সংসারের বুকে বসিয়া তাহার দাঁড়ি উপড়াইবার ক্ষমতা যাহার নাই, তেমন

ব্যক্তি আশ্রমে ঢুকিলে আশ্রমের ভার-স্বরূপ হয়, অনেক সময়ে আশ্রমের কলঙ্কের কারণ হয়।

পুপুন্‌কী আশ্রমে কর্ম্মী নাই। আমরা কর্ম্মী খুঁজিতেছি। পাইতেছি না। যাহারা আসে, তাহারা অযোগ্য। কারণ, তাহারা অলস, অবিনীত, উচ্ছৃঙ্খল। এখানে আমরা মেশিন তৈরী করিতে চাহি না, চাহি মানুষ গড়িতে কিন্তু শৃঙ্খলা যে মানিবে না, সে কেমন করিয়া মানুষ হইবে? দশ জনের একত্র থাকিতে হইলেই শৃঙ্খলার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। এক এক জনে এক এক নিয়মে চলিলে কি করিয়া দিনগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে উন্নতিমুখিনী গতি নিবে? পুপুন্‌কী আশ্রমে কর্ম্মিজীবন গ্রহণ করিতে হইলে কঠোর শ্রমশীলতা চাই। অলসের এখানে স্থান কোথায়?

বারাণসী আশ্রমে কর্ম্মী নাই। সেখানের জন্যও কর্ম্মী খুঁজিতেছি। তাহাকে গাইত-কোদাল মারিতে হইবে না, শাবল-খোন্তা চালাইতে হইবে না, করিতে হইবে লেখাপড়া, প্রেসের কম্পোজ, ছাপার কাজ। কাজ আমরা শিখাইয়া নিব এবং সহিষ্ণুতার সহিত কাল-প্রতীক্ষাও করিব কিন্তু কর্ম্মী ত' মিলে না। ঐ যে প্রত্যহ দুইবার ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে মন্দিরে গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া পাঠ, ভজন, কীর্ত্তন, উপাসনাদি করিতে হইবে, এটাই বড় না-পছন্দের ব্যাপার। দেশের লোকের রুচি বিগড়াইয়া গিয়াছে। অলস এবং অকর্ম্মণ্য লোক ছাড়া অন্যেরা প্রায়ই কোনও আশ্রমে আসিতে চাহে না।

এটা যে কেবল আমাদের আশ্রমেরই অবস্থা, তাহা নহে। প্রায় সকল আশ্রমেরই বোধ হয় ইহাই সমস্যা। আমি যে কয়টী আশ্রমের নাড়ীর খবর নিয়াছি, সেগুলিতে ইহাই ব্যাধি। আশ্রম-পরিচালকেরা সৎকর্ম্মীর অভাবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন।

এজন্যই আমি মালটিভারসিটিকে একটী কর্ম্মি-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছি। কিন্তু প্রতিষ্ঠান গড়িবার কাজ বড় ধীরে ধীরে চলিতেছে। আমার ইহাতে আফশোষ নাই, কিন্তু হয়ত এজন্য একদা তোমাদের আফশোষ করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক মহিমময় মূর্ত্তির ধ্যান আজ কাহারা সত্য সত্যই করিতেছ, বল। তাহারা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়া আমার সুমুখে দাঁড়াও আমি একবার তোমাদের নয়নাভিরাম মুরতিটুকু দেখিয়া তৃপ্তির একটী নিঃশ্বাস ফেলি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ বারাণসী হইতে কলিকাতার পথে ট্রেণে

৭ই পৌষ, ১৩৭৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা নির্ভয়ে উপলব্ধ সত্যকে প্রচার করিয়া যাও। একের পূজাকে প্রবর্ত্তিত কর, প্রতিষ্ঠিত কর, প্রসারিত কর। অন্যেরা দশ

জন, বিশ জন, পঞ্চাশ জন আরাধ্যের উপাসনা করেন, করুক। তাঁহাদিগকে নিজ-পথ হইতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা আমাদের সাজে না। এক হইতে অভিনিবেশের বিচ্যুতি ঘটা যে ভুল, মনে মনে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহারা বহুই যে এক, একই যে বহু, এই দাশনিক তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্বটী অতীব উচ্চ সত্যের ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু কালীকে কালী, দুর্গাকে দুর্গা, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুকে বিষ্ণু ভাবিয়াই তাঁহারা ভজনা করেন। নতুবা শ্রীহনুমানের মুখে কখনো উচ্চরিত হইত না,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে
অভেদঃ পরমাত্মনি,
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ
রামো রাজীবলোচনঃ।

রাম আর কৃষ্ণ যদি এক বস্তুই হইলেন, তবে কৃষ্ণ হইতে রামকে প্রিয়তর করিবার হেতু কি? উভয়ই এক হইলে উভয়েই কেন সমান প্রিয় হইবেন না? হনুমান ত' প্রবর্ত্তক সাধক নহেন, তিনি সিদ্ধ সাধক।

তোমরা বিশ্বের সমস্ত দেবতাকে তোমাদের সমান প্রিয় বলিয়া জানিও, কেন না, সকল দেবতা, সকল দেবতার স্বরূপ, সকল দেবতার মূল মন্ত্র, সকল-দেবতা-সম্পর্কিত সকল তত্ত্ব একটী মাত্র মূল সত্যে স্বীকৃত, বিধৃত, সমন্বিত, সমুচ্চয়িত রহিয়াছে। সেই সত্যটী হইতেছেন প্রণব। ওঙ্কারকে ইতিবাচক পরম সত্য বলিয়া

জানিয়াছ বলিয়াই কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণপূজককে, বিষ্ণুকে আর বিষ্ণুপূজককে, কালীকে আর বিষ্ণুপূজককে, দুর্গাকে আর দুর্গাপূজককে; জিহোভাকে আর জিহোবাপূজককে, বুদ্ধকে আর বুদ্ধপূজককে, যীশুকে আর যীশুপূজককে, আল্লাকে আর আল্লাপূজককে, গৌরাঙ্গকে আর গৌরাঙ্গপূজককে তোমরা পর ভাব না, শত্রু ভাব না,—আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান কর।

দেবতায় দেবতায় যখন পুরাণে পুরাণে কলহ চলে, দৈত্যকে দেবতা যখন মিথ্যাশ্রয় করিয়া ছলনা করেন, তখন কোন্ এক ফাঁকে বৈদিক বিশ্বদেববাদ যে হঠাৎ মাঠে পড়িয়া মার খায়, এই কথাটা আমাদের দেশের বিচক্ষণ ধর্ম্মাচার্য্যেরা যে এখনও বুঝিতে পারেন নাই, ইহা দেখিয়া ক্ষোভে মরিয়া যাই। দেববাক্য, ঋষিবাক্য, আপ্তবাক্য আর গুরুবাক্যের দারুণ হিড়িকের মাঝখানে পড়িয়া বিশ্বদেববাদ আর অতল জলে ঠাঁই পাইয়া ওঠে না।

বেদের ঋষিরা যে কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তি অর্পণ করিতেন, তাহা সত্য। কিন্তু মজা এই যে, একটী দেবতার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত দেবতা ঐ একটী সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতেন, যাহার ফলে সর্ব্বসমন্বয়ী ওঙ্কার তাঁহাদের মনঃপ্রাণ অধিকার করিত, তাঁহারা একেলা একেলা সাধন না করিয়া বিশ্বদেবের ধ্যান করিতে বসিতেন সকলে মিলিয়া, —ধীমহি। বাহিরের অশেষ বৈচিত্র্য একটী পরম সত্যে পূর্ণ স্বীকৃতি পাইয়া নিজের পরিণতি লাভ করিত ওঙ্কারে। কিন্তু মিত্রের অর্চ্চনা

আজ সূর্য্যার্ঘ্য মাত্রে সীমিত হইয়াছে। বিশ্বের সমস্ত দেবতার পূর্ণাবস্থিতির অনুভূতি সে আজ জাগায় না। বরুণ এক প্রাচীনতম বৈদিক দেবতা, তাঁহার পূজা লোপ পাইয়াছে। ইন্দ্র প্রথিতযশা বৈদিক দেবতা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনগিরির চাপে তিনি খাবি খাইতেছেন। ইঁহাদের নাম আজ আর কাহারও হৃদয়-তন্ত্রীতে বিশ্বদেবের পূজার বীণা বাজায় না। মনসা, শীতলা, শনি বৈদিক দেবতা কিনা, তাহার বিচার মহান্ পণ্ডিতেরা করুন কিন্তু ইঁহাদিগকে পূজা করিতে বসিয়া বিশ্বের সমস্ত দেবতার কথা দূরে থাকুক, পাড়ার প্রচলিত পূজা-মন্দিরের নূতন পুরাতন আর কোনও দেবতার কথা ক্ষণকালের জন্যও অভেদমূলক ভাবে স্মরণ-পথে টানিয়া আনে কি না, তাহা সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজার, সর্ব্বজনীন কালীপূজার, সর্ব্বজনীন সরস্বতী পূজার বারোয়ারী পাণ্ডাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। বৈদিক তত্ত্বের অহঙ্কার আমাদের পূরাই রহিয়াছে কিন্তু বেদের বিশ্বদেববাদ পলাইয়া গিয়াছে।

তবে, যিনি যেই দেবতার পূজাতেই নিজেকে সমর্পণ করুন, একনিষ্ঠ প্রযত্নে যদি উহাতেই লাগিয়া থাকেন, অন্যাভিলাষ না করেন, অনন্যলক্ষ্য হইয়া সেই একজনকেই যদি ভজনা করেন, লোকে তাঁহাকে যতই গোঁড়া বা যতই গ্রাম্য বলিয়া গালি দিক্, তিনি একদা একের ভিতরে সব-কিছুর অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিবেনই। এই উপলব্ধিতে আসারই নাম ওঙ্কার-দর্শন। মত-পথের বিভিন্নতা বিচার না করিয়া তোমরা সাধক-মাত্রকেই সম্মান করিও

কিন্তু নিজেরা নিজেদের সত্যে প্রাণপণে লগ্ন রহিও। যশের লোভে, খাতির পাইবার প্রলোভনে, লোককে খুশী করিবার সস্তা মোহে অথবা অন্য কোনও অপ্রকাশ্য কারণে কদাচ নিজপথ হইতে বিচ্যুত হইও না। নিজের মতে নিজের পথে জোর করিয়া নির্লজ্জভাবে লাগিয়া থাকিবার গোঁড়ামি যাহার নাই, সাধন-কর্ম্মে পরম প্রাপ্তি ও চরমলভ্য তাহার করায়ত্ত হয় না। সকলের সকল মত ও সকল পথের প্রতি উদার ও সহিষ্ণু হও কিন্তু নিজের উদারতাকে অপরের নয়নগ্রাহ্য করিবার জন্য বা বিজ্ঞাপনের বাহার রূপে প্রতীয়মান করিবার প্রয়োজনে আন্তরিক সাধন-ধর্ম্মের ব্যাপারে আপোষ করিবার প্রবৃত্তিকে কদাচ প্রশ্রয় দিও না। সতী যদি পতিনিষ্ঠা সম্পর্কে গোঁড়া না হয়, তবে তাহার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

কলিকাতা (মাণিকতলা)

৭ই পৌষ, ১৩৭৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এককেই লইয়াই জীবন কাটাইয়া দাও, হাজার দেবতার পূজার প্রয়োজন নাই।

আগামী কাল রবিবার আমরা সকাল বেলা কাঁকুড়গাছির

বাড়ীর সংলগ্ন ভূখণ্ডে ওঙ্কার-বিগ্রহে অঞ্জলি দিয়া হরিওঁ-নামের নগর-সঙ্কীর্ত্তন লইয়া বাহির হইব। কলিকাতা অঞ্চলের সকল ভক্তেরা যোগ দিবে।

আগামী পরশু মঙ্গলবার আমরা জন্মদিনের সমবেত উপাসনার দ্বারা কাঁকুড়গাছির নবনির্ম্মিত আশ্রয়ে অর্থাৎ গুরুধামে গৃহ-প্রবেশ করিব, বাসস্থান রূপে মাণিকতলা ছায়া সিনেমার ত্রিতলের ফ্ল্যাট পরিত্যাগ করিব। পুপুন্কী হইতে বিষ্ণুপদ আসিতে পারে নাই, ধর্ম্মনগর হইতে সদাসুন্দর আসিতে পারে নাই, ফটিকরায় হইতে সমর্পণ আসিতে পারে নাই। আরও দুই চারিজন সহকর্ম্মী, যাহাদিগকে এই শুভ আনন্দোৎসবে না পাইলে উৎসব আলুনি লাগিবে, তাহারা কেহই আসিতে পারে নাই। কিন্তু সব চেয়ে বেশী অভাব বোধ হইতেছে স্নেহময়ের জন্য। স্নেহময় বারাণসী আশ্রমের একটা গুরুতর ব্যাপারে আটক পড়িয়া গিয়াছে।

স্নেহময় কি লিখিয়াছে, জানো? স্নেহময় সাধনাকে মা বলিয়া ডাকে। সে লিখিয়াছে,—"মাগো, আসিতে পারিলাম না বলিয়া কি যে ব্যথা বোধ করিতেছি, বলিবার নহে। আসিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। কলিকাতা শ্যামবাজারের আশ্রমে এক বাঙ্গালী শেঠের বাড়ীতে বাড়ীওয়ালার নিয়োজিত ডাণ্ডাধারী হিন্দুস্থানী গুণ্ডাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়াও কি দুঃসাহস করিয়া বঁটি দাও হাতে নিয়া তুমি নিজের সম্মান রাখিয়াছিলে, শেঠের লোকেরা সমস্ত জিনিষপত্র কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপরে ছড়াইয়া

দিয়া কি ভাবে তছনছ করিয়াছিল, অধুনা পরলোকগত প্রতিবেশী সুনীল মুখার্জি ব্যতীত একটী প্রাণীও এই গুণ্ডামির প্রতিবাদ করে নাই, সেই দিনকার সেই অপমানের কথা ভাবিয়া দুঃখে ও আনন্দে অশ্রুপাত করিতেছি। দুঃখ এই যে, কলিকাতার একটী যুবকও সেদিন তোমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। আনন্দ এই যে, কাহারও সাহায্য ছাড়াই তুমি তোমার গুরুদেবের বাস করিবার জন্য আকাশস্পর্শী পঞ্চতলবিশিষ্ট গুরুধাম নির্ম্মাণ করিয়া সগৌরবে তাহার গৃহপ্রবেশোৎসব করিতে যাইতেছ।"

স্নেহময় অলীক কিছু লেখে নাই। শ্যামবাজারের বাড়ীর ভাড়া আমরা মাসের পর মাস বছরের পর বছর ঠিকই দিয়া যাইতেছিলাম, তবে দেওয়া হইতেছিল রেণ্টকণ্ট্রোলে। বাড়ীওয়ালা আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সাধনাকে ঐ বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছিল। একটা দিন একটা রাত্রি সাধনা হাতে অস্ত্র লইয়া চল্লিশ পাঞ্চশটী গুণ্ডার হাত হইতে নিজেকে ও আমার তৈজসপত্রকে রক্ষা করিয়াছে। আর, ইহাও সত্য যে, কাঁকুড়গাছিতে সে আজ যে বাসভবন সমাপ্ত-প্রায় করিল, তাহার জন্য সে কাহারও আর্থিক সাহায্য চাহে নাই, অযাচক আশ্রম হইতেও এক কপর্দ্দক নেয় নাই, মালটিভারসিটি হইতেও আমি একটী পয়সা দেই নাই। বারাণসীর আশ্রম ও বাড়ী যেমন সাধনার কঠোর কৃচ্ছ্রের স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে, কলিকাতার গুরুধামও তদ্রূপ হইল। সাধনা বারাণসীতে নিজ হাতে পাখী তৈরী করিত, স্নেহময় পথে পথে

ঘুরিয়া বেচিত। বারাণসী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় এই ভাবে। সুতরাং স্নেহময় আজ কষ্ট অনুভব করিবে, আবার গৌরবও বোধ করিবে, ইহা স্বাভাবিক।

কিন্তু গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজন কি? মানুষ ইহাতে থাকিবে, মানুষের সেবার জন্য জীবনোৎসর্গ করিবে, শত শত মানুষ গড়িবে, ইহারই জন্য ত'? কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য একটী পরম সত্যের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের শিক্ষা চাই। এই শিক্ষা দানেরই অপর নাম মানুষ-গড়া।

এই জন্যই তোমাকে বলিতেছিলাম,—এককে লইয়া জীবন কাটাইয়া দাও, হাজার দেবতার পূজার প্রয়োজন নাই। তোমাদের মন্ত্রবাণী হউক,—

একেরে জানিয়া সত্য জীবনে মরণে
তাহারি করিব পূজা বাক্যে আচরণে।

আমাদের আদর্শ-পোষক বাক্য হইবে এক রকম আর আমাদের জীবনের অনুষ্ঠানগুলি হইবে অন্য রকম, এই অসামঞ্জস্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

ভাল কথা, এই পত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দুইটী কথা না বলিয়া পারিতেছি না। খিচুড়ী মহারাজকে আমি বড়ই ভক্তি করি কিন্তু বড় ভয় করি। যে-কোনও উৎসবে ইঁহার আবির্ভাব হইলে পঙ্গপালের মত খিচুড়ী-ভক্ষণকারীরা কোথা হইতে যে জুটিয়া

যায়, বলা কঠিন। সারা বৎসর যাহাদের মুখচ্ছবি একটীবারও নয়নের কোণে ঝলকিয়া ওঠে নাই, খিচুড়ীর সংবাদে সহর ও পল্লীর আনাচ কানাচ হইতে তাহারা আসিয়া পংক্তিতে বসিয়া যে নিদারুণ ভিড় করে, তাহা সামলান দায়। শ্রীচৈতন্যদেবের খিচুড়ী আর শ্রীবিবেকানন্দের খিচুড়ী জাতিভেদ-জ্ঞানকে যে বেশ বেদম প্রহার করিয়াছে, ইহা সত্য কিন্তু ভাবী ভারতের আর্থিক দুর্গতির কথা ত' ইঁহারা অনুমান করেন নাই! তোমরা আমার জন্মোৎসবে বা অন্যান্য উৎসবে খিচুড়ী-পর্ব্বকে, যতটা পার, খর্ব্ব করিয়া রাখিও এবং আসল তথা স্থায়ী সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলির দিকে দৃষ্টি দিও। তোমাদের অন্তরে প্রকৃত প্রেম থাকিলে ইহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। তোমাদের জীবন-চর্চ্চা কি প্রেমের চর্চ্চা নহে?

আর একটী কথা এই যে, মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে দেখিতেছি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য বড়ই অধ্যবসায়, বড়ই চেষ্টা। কেহ ধানক্ষেত কিনিতেছে, কেহ মন্দির গড়িতেছে, কেহ পুকুর কাটিতেছে, কেহ স্কুল খুলিতেছে। কেন তোমরা ভুলিয়া যাইতেছ যে, মালটিভারসিটিটা গড়িয়া উঠিবার পরে এসব স্থানীয় প্রচেষ্টা তোমরা অবাধে সফল করিতে পারিবে? স্থানীয় সম্পদ এবং সাময়িক কৃতিত্ব বাড়াইবার দিকে নজর দিয়া তোমরা ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত অতি প্রধান কাজটীর কি ক্ষতি করিতেছ, কেহই

বুঝিতেছ না, মনে হয়। তোমাদের মণ্ডলীগুলিকে এই সকল কাজে বাস্তব সহায়তা ও আর্থিক দাক্ষিণ্য প্রদানের জন্যই ত' আমি অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহা ভিক্ষা না করিয়া আয় করে, দান গ্রহণ না করিয়া দান করে, যাহা কেন্দ্রীয় কতকগুলি নিদারুণ প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিবার পরে প্রতি বৎসর এক একটা করিয়া মণ্ডলী ধরিয়া তাহার জন্য সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিবার আশাও রাখে, সামর্থ্যও রাখে। তোমরা মালটিভারসিটিটার দ্বারোদ্ঘাটন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছ না কেন?

আমি মালটিভারসিটির জন্য প্রাণপাত করিতেছি, এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমরাও কেহ কেহ প্রাণপরত করিয়া শ্রম করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহা কত বড় এক গৌরবের কথা। কিন্তু তোমাদের সকলের উদ্যম এক স্থানে প্রযুক্ত না হইয়া স্থানে স্থানে প্রযুক্ত হইতেছে। ইহা প্রেমের অভাব না অপূর্ণতা, ইহা প্রেমের ঘাটতি না অপরিণতি, তাহা ভাবিয়া দেখিও ত'! তোমরা প্রেমের পূজারী, তোমরা এমন অপ্রেমিক হইতেছ কেন? প্রাণপাত করিয়া খাটিবার জন্য আমাকে তোমরা তোমাদের মধ্যে আর কয়টী বৎসর পাইবে বলিয়া মনে কর?

স্কুল তোমরা একটা যেন খুলিলে। খুব ভাল কথা। কিন্তু ছাত্র চাই। সুতরাং অভিভাবকদের শরণাপন্ন হইলে। ছাত্রেরা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিল না, অভিভাবকেরা অন্য স্কুলে নিয়া গেলেন।

ভয়ে তোমরা ছাত্রদের পরীক্ষায় পাশে সহায়তা করিতে লাগিলে। তাহাদের খাতা উদার ভাবে দেখিতে হইবে, হুকুম হইল পরীক্ষকের উপর। ছাত্রেরা লুকাইয়া লুকাইয়া বই হইতে টুকিয়া নকল করিয়া পরীক্ষা দিলে গার্ডকে বলিয়া দিলে, সাবধান, কিছু বলিও না। ইহাই ত' তোমাদের স্কুলের নমুনা। অথচ স্কুলটীর নামকরণের সময়ে উহার সহিত আমার অথবা কোনও খ্যাতনামা আদর্শ পুরুষের নামটীও সাইনবোর্ডে সংযোজিত হইল। চমৎকার নাটক!

নাটক আর প্রেম এক কথা নহে। তোমাদের জীবনধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। প্রেম কখনো কখনো নাটকও হইয়া পড়ে কিন্তু সে নাটক নীতিভ্রষ্ট কুজীবনের দৃষ্টান্ত হইবে কেন?

স্কুলে মাষ্টাররা পড়ায় না। পড়াইতে বসিয়া কুৎসিত প্রসঙ্গ আলোচনা করে। যাহার সহিত পাঠ্য বিষয়ের সংশ্রব নাই এবং যাহা তরুণ-তরুণীরা একত্র বসিয়া শুনিতে পারে না। অথচ বিদ্যালয় খুলিয়াছ কো-এডুকেশনের। এমন মাষ্টারের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন হইলে তোমরা সেক্রেটারী-প্রেসিডেণ্টের দল মাষ্টারকে বাঁচাইবার জন্য অভিমন্যুর মতন চক্রব্যূহ ভেদ করিতে উদ্যত হও। অথচ প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছ একটী আদর্শের দোহাই দিয়া।

এই সকল গোঁজামিল তোমাদের জীবনে আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইতেছি। তোমরা সকলকে খুশী করিবার

চেষ্টা করিতেছ, ফলে কাহাকেও খুশী করিতে পারিতেছ না। এই জন্যই বারংবার বলি,—

একজনারে জান্‌রে আপন,
একজনারে জান্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৩ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৭৪
(২৯-১২-৬৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ২রা পৌষের পত্র পাইয়াছি। আমার সুস্থ সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তোমরা নানাস্থানে সমবেত উপাসনা করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। কিন্তু তোমাদের প্রতিজনকে সৎকর্ম্মান্বিত ও জগন্মঙ্গলপরায়ণ দেখিলেই আমি খুশী, আমি দীর্ঘ জীবনের কামনা করি না। তোমরা প্রতিনিয়ত সৎকর্ম্মে লগ্ন হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের এই অবস্থাটীরই নাম আমার জীবন। অন্যতর ভাবে আমি জীবনকে দেখি না। সর্ব্বজীবাভিসারী প্রেমে তোমরা মাতোয়ারা হইয়াছ, তোমাদের এই অবস্থাটীরই নাম আমার জীবন। আমার এই জীবন দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম হউক,

আমার এই জীবন শাশ্বত, অফুরন্ত ও অনন্ত হউক, ইহাই আমি কাম্য মনে করি।

এবার কাছাড়ের বদরপুরে তোমরা পাহাড় অঞ্চল হইতে কিছু নাগাকে দীক্ষা গ্রহণের জন্য নিয়া আসিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। নাগা ভাষাতে আমার দখল নাই বিধায় দীক্ষাকার্য্য কিঞ্চিৎ সীমাবদ্ধ পরিসরে হইয়াছে বটে কিন্তু দীক্ষাগ্রহণান্তে ইহাদের ভিতরে যে উদ্দীপ্তি দেখিলাম, তাহাতে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি। নাগাদের ভিতরে আমাদের যে কাজ সুরু হইয়াছিল, নানা অপ্রত্যাশিত ও উৎপাতজনক অবস্থার সৃষ্টিতে তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় সেই কাজের সূচনা হইল দেখিয়া আমি উৎফুল্ল হইয়াছি। তোমরা যোগ্যভাবে সংগঠন চালাইতে থাক, কেহ কাজে ঢিলা দিও না।

বনপর্ব্বতবাসী সুদূরে স্থিত অবহেলিত নরনারীদের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ বলিয়া ও লিখিয়া আসিতেছি। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ একাজকে আমি একটা আন্দোলনের মূর্ত্তি দিয়াছি। আমার আন্দোলন চাঁদা-সংগ্রহের ভিত্তিতে চলে না বলিয়া আমাকে সর্ব্বদা নিজের সীমিত আয়ের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। অবশ্য তাহার দরুণ আমার কাজের মর্য্যাদা ও উপযোগিতা কমে নাই কিন্তু বিস্তার ব্যাহত হইয়াছে। ভিক্ষা করিয়া, চাঁদা তুলিয়া, দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া অনিচ্ছুক গৃহস্থের কষ্টার্জ্জিত পয়সাগুলির কণা

কণা করিয়া কুড়াইয়া আনিয়া জনসেবা-সাধন আমার রীতি নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার নিকটে বছরে নানাস্থান হইতে স্বনামে ও বেনামীতে দুই তিন শত করিয়া অভিযোগ-পত্র আসে যে, আমি কেন অমুক পাহাড়ে আমার ধর্ম্মাভিযান পরিচালন করিলাম না, আমি কেন তমুক পাহাড়ের কাজের প্রগ্রাম ছাপাইয়াও কার্য্য-কালে সেখানে হাজির হইতে পারিলাম না। কিন্তু কি ভারতীয় জনসমাজ, কি ভারতীয় সংবাদ-পত্র, কেহই ত' আমাকে একটী বারের অভিযানেও কণামাত্র সহায়তা করিবার জন্য আগাইয়া আসেন নাই। আমাদের সংবাদ তোমাদের সবচেয়ে বেশী সমাদৃত দৈনিক কাগজগুলিতে পাঠাইলে তাঁহারা ছাপেন না কিন্তু তথাপি সকলের প্রত্যাশা এই যে, আমরাই গিয়া পার্ব্বত্য জাতিগুলির মধ্যে বারংবার জীবন বিপন্ন করিয়া প্রবেশ করিব এবং নাগা, রাংখল, মিজো, রিয়াং, মিশমী, মিকির, ডিমাছা প্রভৃতিকে তোমাদের সমাজের মধ্যে টানিয়া আনিব। যেই সকল সংবাদ প্রচারে সমাজের লাভ,—শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইও না যে,—সেই সকল সংবাদ কলিকাতার একটী দৈনিকে প্রকাশের জন্য দুই তিন মাসে আমাকে নগদ তিন হাজার টাকার উপরে দক্ষিণা দিতে হইয়াছে। অন্ধ সমাজ এবং বিজ্ঞ সংবাদ-পত্র কেহই তোমাকে কোনও সহায়তা দিবেন না, ইহা জানিয়া নিয়াই তোমরা প্রাণপণ যত্নে সংগঠন-কার্য্য চালাইয়া যাও।

পাহাড়ী বস্তিগুলির কাছাকাছি স্থানে যে সকল বঙ্গভাষী চাকুরে

বা প্রবাসী নরনারী আছে অথবা যাহারা পেটের দায়ে এই সকল দুর্গম অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সেই সকল লোক তোমাদের কাজে অশেষ সহায়তা প্রদান করিবে। আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি যে, যেই সকল অঞ্চলে আমরা পাহাড়ীদের ভিতরে যাই, তাহার কাছাকাছি স্থানের বঙ্গভাষীরা নানা ভাবে বড়ই সহায়তা করেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। আমার মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই তাঁহাদের কাছে এই সহায়তা সহজলভ্য হয়। তাঁহারা যখন স্বতঃপ্রেরণায় আগাইয়া আসেন, তখন অন্যভাষাভাষীরাও প্রাণের আবেগে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। আমি নামজাদা কোনও বড় দেশনেতা নহি, সুতরাং সহায়তার পরিমাণটা স্বভাবতই অল্প হয় কিন্তু অযাচিত ও শ্রদ্ধাপূত বলিয়া তাহার কৌলীন্য হয় অসাধারণ।

এই জন্য তোমাদিগকে বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ দিতে চাহি যে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের পঞ্চাশ মাইলের ভিতরে যত বঙ্গভাষী আছেন, তাঁহাদের ভিতরে তোমরা অতীব গভীরভাবে সঙ্কর্ষণ সুরু কর, ব্যাপক ভাবে তাঁহাদের প্রতিজনকে তোমাদের জীবনাদর্শের সমীপস্থ করিবার জন্য প্রয়াসপরায়ণ হও, প্রবল ভাবে তাহাদের হৃদয়মনকে মথিত করিবার আয়োজনে লাগিয়া যাও।

প্রকৃত কর্ম্মীর নিকটে বিশ্রাম গ্রহণের প্রবৃত্তি একটী পাপ। এই পাপ হইতে তোমরা দূরে থাকিও। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে যতটুকু বিশ্রামের দরকার, তার বেশী বিশ্রামের লোভ কেহ করিও

না। প্রকৃত কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রেরণা প্রেম হইতে আসে। প্রেম কখনো বিশ্রাম, বিরাম, যতি বা সমাপ্তি পছন্দ করে না। প্রেম চাহে দুর্ণিবার গতি, দুর্দ্দম্য প্রসার। তোমরা প্রেমিক হও। প্রেম আসিলেই তোমাদের কর্ম্মের অর্দ্ধেক সাফল্যলাভ হইয়া গেল, জানিও। ভালবাস, কেবল ভালবাস, বনপর্ব্বতে চিরঅবজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া যাহারা অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করিতে করিতে পশুর মতন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ভিতরে দেবত্ব-সম্ভাবনাকে প্রাণ ভরিয়া একবার পূজা কর। তবেই সকল কাজ সিদ্ধ হইবে।

হিন্দু-সমাজের একদল লোক আমার কার্য্যাবলি বড়ই অপছন্দ করেন কিন্তু বন-পাহাড়ে আমি যে কাজটুকু করিয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেছি, তাহার আবার তারিফও করেন। আমার মনে হয়, এই সকল ভদ্রলোকেরা মনে মনে ভাবিতেছেন যে, বন-পর্ব্বত হইতে ধরিয়া আনিয়া আমি কতকগুলি লোককে তাঁহাদের বংশানুক্রমিক দাসের কাজ দিয়া কৃতার্থ করিব। কিন্তু ইহা ভুল। প্রকৃত ব্রাহ্মণ আজ ভারতে নাই, তাই আর কোনও শূদ্র ইহাদের দাস বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিবে না। আমি যে নূতন আর একদল দাস সৃষ্টির জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া পরমায়ু-ক্ষয় করিতেছি না, এই কথাটিকে ধ্রুব সত্য জানিয়া তোমরা আমার কাজে আত্মনিয়োগ করিও।

বদরপুরে আসিয়া যাহারা এবার দীক্ষা নিয়া গেল, সেই নাগাদের কাহাকেও কাহাকেও দেখিয়া আমার মনে হইল যে, ইহাদের দ্বারা আস্তে আস্তে সমগ্র নাগাজাতির ভিতরে অল্পাধিক

কালমধ্যে অখণ্ড-আন্দোলন এক বিপুল বিরাট ব্যাপক রূপ ধারণে সমর্থ হইলে হইতে পারে। যাহা হইলে হইতে পারে,তাহাকে তাহা হইতে বাধ্য না করার মধ্যে অন্য কোনও যুক্তি থাকিতে পারে না, বাদে আলস্যের, অবহেলার আর কাপুরুষতার যুক্তি। তোমরা অতুল সাহসে ভর করিয়া অটুট উদ্যমে কাজে লাগিয়া যাও।

চারিদিকের অবস্থা সমূহ ও ঘটনা নিচয় দেখিয়া কি অনুভব করিতে পারিতেছ না যে, এখন তোমাদের সেই সময়টী আসিয়া গিয়াছে, যখন অল্প শ্রম করিলেও বেশী ফল পাওয়া যাইবে? এখন আর তোমরা একজনেও বসিয়া থাকিতে পার না। এবার কাছাড় ও ত্রিপুরায় যে তেইশটী দিন আমি ও সাধনা ভ্রমণ করিলাম, তাহার প্রতিটি দিনেই কি ঐ একটীমাত্র কথাই প্রমাণিত হয় নাই? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

কোলাঘাট

সোমবার, ৮ই মাঘ, ১৩৭৪

২২-১-৬৮ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। কল্যাণীয়া মাকে এবং শিশুদের স্নেহ ও আশিস দিও।

"জনসংখ্যা কমাও, জনসংখ্যা কমাও" বলিয়া এই যে দেশব্যাপী নিদারুণ হট্টগোল উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। দেশের জনসংখ্যা কমাইবার আন্দোলনের ভার আমাদের মত গৃহত্যাগী অসংসারী লোকদের উপর ছাড়িয়া দিয়া সরকারী কর্ত্তারা যদি নিজেদের সবটা শক্তি ও ধ্যান একমাত্র দেশের ধনোৎপাদক, শস্যোৎপাদক, জাতীয় সম্পদের বর্দ্ধক, শিল্পের প্রসার-সাধক উপায়গুলির উপরে নজর দিতেন, তাহা হইলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে অসম্পূর্ণ মানুষের উপরে অতি-প্রাধান্য অর্পিত হওয়ায় দেশের ভাবী জীবনের উপরে নিদারুণ বজ্রাঘাত ঘটিল। সম্ভবতঃ অতি প্রাধান্যলুব্ধদের চিত্ত-দৌর্ব্বল্যই দেশের ব্যবচ্ছেদ সৃষ্টি করিল, সহস্র সহস্র লোককে ঘাতকের হস্তে বলি দিল, লক্ষ লক্ষ লোককে উদ্বাস্তু করিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল, কোটি কোটি লোককে নানা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে নিপাতিত করিল এবং এখন পর্য্যন্তও যে এক কোটির অধিক লোক নিজ জন্মভূমিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হইয়া মহাঅস্বস্তিতে কাল কাটাইতেছে, এমন একটী কলঙ্ককর অবস্থার জন্ম দিল। যাহাদের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় সাধনার প্রতি গভীর কোনও আস্থা নাই, এমন ব্যক্তিদের মোহগ্রস্ত বিচারবুদ্ধি আজ জনসংখ্যা কমাইবার কৃত্রিম ও অতি কুৎসিত আন্দোলন সমূহ চালাইতেছে। সাধারণ লোককে ব্যর্থতার খবর বিন্দুমাত্রও জানিতে না দিয়া টাকার জোরে প্রচারক ও

চিকিৎসকদের বিবেককে ক্রয় করা কি কঠিন কাজ? জরায়ু-মধ্যে ল্যুপ ঢুকাইয়া সন্তান-জনন বন্ধ করা হইতেছে কিন্তু কাহারও কাহারও ল্যুপ হঠাৎ বাহির হইয়া আসিতেছে, এমন কি অজানিতেও এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। বোম্বের এক মেডিক্যাল জার্ণালে পড়িয়াছি যে, ল্যুপটীকে নিজের শরীরের অংশরূপে লইয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া ডাক্তারের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-সদৃশ অপদস্থতা উপঢৌকন দিয়াছে। ডিব্রুগড়ের এক বিজ্ঞ চিকিৎসক এইরূপ একটী ল্যুপগ্রস্ত শিশুর মৃতদেহ স্পিরিটে রক্ষিত অবস্থায় আসামের কোনও হাসপাতালে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া আমাকে বলিয়াছেন। শিশুর শরীর হইতে ল্যুপটী বাহির করিয়া আনিলে অস্ত্রাঘাত-ক্লেশে শিশুটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে, আবার ল্যুপটী তখনি না সরাইলে শিশু ত' ক্রমশঃই বাড়িবে, ল্যুপ ত' সেলুলয়েড় জাতীয় জিনিষের তৈরী একটা জড় পদার্থ বিধায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে না, সুতরাং এই ল্যুপের জন্যই পরে ইহার মৃত্যু ঘটিবে,—এই উভয়-সঙ্কট ডাক্তারদিগকে উৎপীড়িত করিবার আগেই পুণ্যবান্ শিশুটী স্বয়ং আনন্দ করিতে করিতে স্বর্গধামে প্রবেশ করিয়া সকল সঙ্কট মোচন করিয়া দিয়াছে। যে সকল জেলীর সাহায্যে জরায়ুমুখেই শুক্রকীটের মৃত্যু ঘটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, বিজ্ঞ যৌনবিশারদেরা বলিতেছেন যে, ইহাদের ব্যবহার-ফলে আপাততঃ সন্তান-জন্ম নিরুদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু নারীর যদি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গর্ভধারণ ও সন্তানোৎপাদন-

ক্ষমতা স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধ হইয়া যাইবার থাকে, তবে এই প্রক্রিয়ায় জনন-নিরোধের ফলে তাহার ভিতরে ষাট পয়সট্টি বৎসর পর্য্যন্ত জনন-ক্ষমতা অটুট থাকিয়া যাইতেছে, যাহার ফলে সুদিনে ইনি সন্তান প্রসব করিলেন না কিন্তু বয়স পার করিয়া হঠাৎ দুর্দ্দিনে সন্তানের মা হইয়া নিজেও বিপন্না হইবেন, সন্তানটীকেও অযত্নে অকূলে ফেলিবেন। ভগবানের নিজের গড়া বিধানই রহিয়াছে যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নারীর রজোদর্শন বন্ধ হইবে, সন্তান-জনন-সম্ভাবনা চলিয়া যাইবে। কৃত্রিম জনন-রোধ-চেষ্টা ভগবানের সেই বিধানকে বিলম্বিত করিয়া দিতেছে। কেবলি গুতাগুতি ধাক্কাধাক্কির জন্য যৌনমিলন ত' পশুও করে না, তবে মানুষ এমন হীন স্তরে নামিবে কেন?

নারীদের নাড়ীচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগকে বন্ধ্যা করিবার প্রকল্প খুব জোরেই চলিয়াছে কিন্তু ইহাতে স্ত্রী সতীত্বের উপরে স্বামীর সন্দেহবায়ু এবং স্বামীর একনিষ্ঠতা সম্পর্কে স্ত্রীর সংগুপ্ত সংশয় রূপ একটি মানসিক ব্যাধির নিদারুণ বিস্তার ঘটিতেছে। আমি এরূপ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অনেক দম্পতির মর্ম্মকথা নিজ কাণে শুনিয়াছি। অন্য প্রমাণ অনুসন্ধানের আমার প্রয়োজন ঘটে নাই।

পুরুষের শুক্রবাহী নালি কাটিয়া তাহাকে খাসী করিয়া দিয়া জননরোধের চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের মনে ক্লীবত্বের ভীতি আসিয়া যাইতেছে, যাহার ফলে নিজ পৌরুষ নিজ স্ত্রীতে প্রমাণিত করিয়াই তাহারা খুশী থাকিতে

পারিতেছে না, এবং নিজের পৌরুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য তাহারা অন্যা নারীতে উপরত হইতেছে এবং একবার অন্যা নারীর স্পর্শ পাইবার পরে তাহাদের দুঃসাহস বেপোরায়া হইয়া যাইতেছে। —এই কথা আমারই শিষ্য একজন বিলাত ফেরৎ যৌনবিদ্যা-বিশারদের লিখিত প্রবন্ধে পাঠ করিলাম, যাহাতে অন্যান্য বহু বিজ্ঞ যৌনবিশেষজ্ঞের উক্তির উল্লেখ আছে।

এখন অবস্থাটা বোঝ। নৈতিক নিম্নগামিতা যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াই গেল কিন্তু ভৌমিক কুশল যাহা হইবার, তাহা হইল না। ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষ সন্তান-সংখ্যা কমাইবার জন্য কোনও চেষ্টাই করিবে না, ডাক্তাররা তাহাদের দুয়ারে প্রচারকার্য্য করিতে গেলে লাঠি-ঠ্যাঙ্গার দাপট দেখিয়া চুপ মারিয় চলিয়া আসিবে। দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণ সংসারের একটা স্বাভাবিক আমোদ-আনন্দের মাঝখানে ল্যুপ, জেলি, কনডোমের অন্তরাল সৃষ্টি করিবে না, তাহাদিগকে ইহা করিতে বাধ্য করা যাইবে না। বুদ্ধিমান্, অর্থবান্, সামর্থ্যবান্ বংশগুলিই এই বিলাস লইয়া দুদিনের ইতর খেলা খেলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

ইহা ভারতীয় চিন্তার অনুকূল নহে। সংযমের বলেই জনসংখ্যা কমাইতে হইবে, একথা আমি বর্ত্তমান রাষ্ট্রকর্ণধারেরা হাফপ্যাণ্ট পরিতে শিখিবার আগে তারস্বরে জাতিকে শুনাইয়াছি। আমার এই 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন' নানা স্থানে শিকড় গাড়িয়াছে এবং শুধু একটীমাত্র মানুষের কণ্ঠধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আজ

সহস্রের উপরে দম্পতি নানা স্থানে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পবিত্র দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া যাইতেছে। ইহাদের ব্রত-পালনের সফলতা অকৃত্রিম, কারণ ইহারা বাহিরের লোকের যশঃকীর্ত্তন কামনা করে নাই, নিজেদের আশ্চর্য্য সংযমশক্তির প্রশস্তি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখিতে লোলুপ হয় নাই। সহস্র জনের পক্ষে যে কথা সত্য হইতে পারিয়াছে, লক্ষ জনের পক্ষে, কোটি জনের পক্ষে, সে কথা কেন সত্য হইতে পারিবে না? আমার একটী কণ্ঠ বিবাহিতদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছে—"সংযমী হও", তাহার ফলে যদি সহস্র জনের জীবনে যুগান্তর আসিয়া থাকে, তবে সহস্র জনে সহস্র কণ্ঠে এই কথা বলিতে থাকিলে এই পুণ্যময় অনুশীলনটী কেন দেশব্যাপী বিস্তার লাভে অসমর্থ হইবে বল ত'! তোমরা প্রতি দম্পতি ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিয়া দেখ, ইহাতে কত আনন্দ, কত শক্তি, কত তৃপ্তি, কত নিশ্চিন্ততা। কৃত্রিম উপায়ে যাহারা জনন-রোধের চেষ্টা করিতেছে, তাহারা ডাক্তারের পকেটে অবিরাম টাকা ঢালিতেছে, কারণ আজ এই নূতন অসুখ, কাল সেই আশ্চর্য্য ব্যাধি লাগিয়াই আছে।

ছাগ এবং ছাগীকে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দেওয়া বৃথা। কেন না, ছাগী হয়ত বিধির নিয়ম মানিবে, ছাগ মানিবে না। তার কামের কাল অকাল নাই, সময় অসময় নাই, বিধি অবিধি নাই, পাত্র অপাত্র নাই, স্থান অস্থান নাই। কিন্তু মানুষেরা ছাগও নহে, ছাগীও নহে। ভারতবর্ষে যে মানুষ সত্যই এখনও আছে, এই

বিশ্বাস ত' আমরা হারাইতে পারিতেছি না। আমাদের আবেদন মানুষের কাছে, কারণ মানুষ মানুষের কথা বুঝিতে পারে, পালিতে পারে। তোমরা মানুষ খোঁজায় লাগিয়া যাও, ছাগ ও ছাগীগুলিকে বাদ দিয়া চল। মানুষেরা নিজ নিজ দাম্পত্য জীবনে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী সন্তান হইবার পরেই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিজ নিজ পুত্রকন্যার চক্ষে দেবদেবীর সম্মান অর্জ্জন করিয়া বার্ধক্যে হইবে তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের অধিকারী আর দেশে যুদ্ধ লাগিলে ছাগছাগীর বাচ্চাদিগকে Conscription করিয়া ধরিয়া নিয়া আমরা রণদেবতার পূজায় বলি দিয়া বলিব, "তোরাও ধন্য, দেশের কাজে আসিলি।"

ইহাই তোমাদের সুনিশ্চিত মনোভঙ্গী হওয়া প্রয়োজন।

পুরুষ যে নারীতে আসক্ত হয়, তাহার আসল ব্যাপারটা কি? নারী যে পুরুষে আসক্ত হয়, তাহারই বা আসল ব্যাপারটা কি? স্বামী তাহার স্ত্রীর অন্তরের অন্তরে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে চাহে। স্ত্রীও তাহার স্বামীর অন্তরের অন্তরে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে চাহে। তাহাদের দৈহিক মিলন এই আন্তরিক একাত্মতার ভূমিকা রূপে কাজ করে। যৌনমিলনের এইখানেই যাহা-কিছু সার্থকতা। নতুবা মিলন নিতান্তই একটা mechanical মিলন বা যান্ত্রিক ব্যাপারে গিয়া পরিণত হয়, যেমন ধর, কৃত্রিম শুক্রাধানের প্রয়োজনে আসল গাভীটাকে সম্মুখে রাখিয়া পশুচিকিৎসকেরা কামোন্মত্ত বৃষটাকে একটা ডানলপ্ রবারের কৃত্রিম গো-যোনি

দিয়া প্রতারিত করে। সাধারণ মানুষ যে স্ত্রীসঙ্গ বা স্বামিসঙ্গ করে, তাহা ত' এইরূপ একটা আত্মপ্রতারণা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। স্বামিপত্নী পরস্পর আসঙ্গাসক্ত হইবে অথচ করিবে আত্মপ্রবঞ্চনা, ইহা মানুষের কাজ নহে, ইহা গবেষণাগারের বন্দী ছাগ, বৃষ, মূষিকের কাজ।

প্রেমই দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করে, প্রেমহীনতাই দাম্পত্য জীবনকে পরিম্লান করে। কৃত্রিমতার পথে প্রেম আসে না। তোমরা নিজ নিজ জীবন হইতে কৃত্রিমতাকে নির্ব্বাসিত কর এবং পরম-প্রেমময় শ্রীভগবান্‌কে পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শ্রেষ্ঠ গৌরব, শ্রেষ্ঠ লভ্য অর্জ্জন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ বালিচক (মেদিনীপুর)

মঙ্গলবার, ৯ই মাঘ, ১৩৭৪

(২৩-১-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের সকলের না হউক, অনেকের ভিতরে একটা অদ্ভুত দুর্ব্বলতা দেখিতেছি। সমবেত উপাসনায় পকান্ন-ভোগ দেওয়া

আমি নিষিদ্ধ করিয়াছি। কারণ, আমি চাহি যে, ভোজনাদি ব্যাপারে যাহার মনের সংস্কার যাহাই থাকুক, সমবেত উপাসনার মতন পবিত্র অনুষ্ঠানে তাহা নিয়া যেন কোনও কলহ বা মনোভঙ্গের সৃষ্টি না হয়। অনেকে অনেকের হাতের রান্না-করা অন্ন খান না। ইহা ভাল কি মন্দ, বিচার করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি চাহেন না খাইতে, তবু আমরা জোর করিয়া খাওয়াইব, এই জবরদস্তি স্থান অখণ্ড-মতবাদের মধ্যে নাই। এমন লোক অনেকে আছেন, যাঁহারা নিজ পুত্র, কন্যা বা স্ত্রীর হাতের রান্না-করা পক্কান্নও ভোজন করেন না। আমি প্রসিদ্ধ মৃদাঙ্গাচার্য্য নবদ্বীপ ব্রজবাসীকে দেখিয়াছি, তিনি নিজের স্ত্রীর হাতের রান্না-করা অন্নও খাইতেন না, নিজের অন্ন নিজে রাঁধিয়া খাইতেন। ইহা তাঁহার দোষ না গুণ, তাহা বিচার করিবার অধিকার আমাদিগকে কেহ দেয় নাই। আমি নিজ জীবনে দ্বাদশ বর্ষ স্ত্রীলোকের মুখ দেখি নাই, দ্বাদশ বর্ষ স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও হাতের রান্না খাই নাই। ইহা কি আমার দোষ না অপরাধ, তাহা বিচার করিবার অধিকার জনসাধারণকে কে দিয়াছে? অধিকার জিনিষটা কষ্ট করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়, রসনা-চাপল্যেই অধিকার আসে না। আমি এখন ত' অতি কঠোর নিয়মে বিধান করিয়াছি যে আমার সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী ছাড়া অন্য কেহ আমার পক্কান্ন বা ফলমূল কিছুই তৈরী করিতে পারিবে না। ইহা আমার জাতি-বিদ্বেষ বা মানব-বৈরিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে কি? বারংবার বিষ-প্রয়োগ করিয়া আমার প্রাণাত্যয়

ঘটাইবার অপচেষ্টা ঘটিবার দরুণই যে এই কঠোর নিয়মটী করিতে হইয়াছে, সেই কৈফিয়ৎ কাহাকেও আমি দিতে বাধ্য কি? কেহ আসিয়া সমবেত উপাসনায় প্রদত্ত তোমাদের রন্ধিত পায়সান্ন বা খেচরান্ন খাইলেন না বলিয়া তাঁহাকে দোষী করিবার তোমাদের অধিকার নাই। অপর মানুষের সংস্কার-ভাঙ্গা বা জাতিভেদ, পংক্তিভেদ প্রভৃতি বদ্ধমূল সামাজিক প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া আমাদের সমবেত উপাসনার উদ্দেশ্য নহে পরন্তু বিশ্বের সকল মানবকে লইয়া একত্র বসিয়া নির্ব্বিরোধে বিশ্বপ্রভুর অর্চ্চনাই আমাদের সমবেত উপাসনার উদ্দেশ্য। আসল কথা ভুলিয়া গিয়া তোমরা এই সকল চপলতা দ্বারা অখণ্ড-মতবাদের উদার ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিতে যাইও না।

আমিই সমবেত অখণ্ড-উপাসনার প্রবর্ত্তক, আমিই বিধান করিয়াছি যে, সমবেত উপাসনা ভোগ-নৈবেদ্য ছাড়াও হইতে পারিবে। আমিই বিধান দিয়াছি যে, পক্কান্ন-ভোগ কদাচ দেওয়া হইবে না। অন্যান্যকে পক্কান্ন ভোজন করাইতে চাহ ত' আলাদা স্থানে তাহা রন্ধন কর এবং সমবেত উপাসনার খৈ-নারিকেল-নাড়ু আদি প্রসাদ তাহাতে মিশাইয়া দিয়া সেই খেচরান্ন বা পরমান্ন ভক্তিমান প্রসাদলিপ্সু দিগকে বিতরণ কর। তোমরা পরের ছেলের অন্ন-প্রাশনের সময়ে আমার নির্দ্দেশ পালন করাইয়া প্রশংসাভাজন হইবে আর নিজের ছেলের অন্ন-প্রাশনের সময়ে আমার নির্দ্দেশগুলি অমান্য করিয়া বাহাদুরী দেখাইবে, এই কপটতা ও

ঔদ্ধত্য তোমাদের চরিত্র হইতে দূর করা প্রয়োজন। শ্রীশ্রী উপাসনা প্রণালীর অষ্টাবিংশ পৃষ্ঠার শেষ তিন পংক্তিতে লিখিত আছে, —"সমবেত উপাসনায় পক্কান্ন ভোগ না দিয়া উপাসনান্তে প্রচলিত প্রসাদের সহিত পায়সান্ন মিশাইয়া শিশুর মুখে প্রদান করিলে অন্নপ্রাশন হইবে।" ইহা কি তোমরা দেখ নাই বা ইহার অর্থ কি তোমরা বুঝিতে পার নাই?

একজন অন্ত্যজ-ঘরের ছেলে আমার নিকটে দীক্ষা লইল, আমি তাহাকে উচ্চতম সোপানে উঠিবার পথ দেখাইলাম, প্রেরণা দিলাম, সে তার পরে গিয়া সাধন করিল না কিন্তু জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিচরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত নিজের সমত্ব প্রচার করিয়া ধৃষ্ট উক্তি ও উদ্ধত ব্যবহার সব করিতে লাগিল। বল, ইহা দ্বারা আমার প্রদত্ত ব্রাহ্মী দীক্ষার সম্মান কতটুকু বাড়িল?

আমার শিষ্যকুলের দ্বারা দেশ ভরিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখিতে পাই যে সাধকের সংখ্যা বাড়িতেছে, তবে ত' আমি আনন্দ করিব! কিন্তু যদি দেখি, অপরের স্বাধীন আচরণে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য একদল উদ্ধত পাষণ্ড মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, তবে ত' আমাকে মনের দুঃখে কাঁদিতে হইবে। আমার শিষ্যের ভিতরে এরূপ ঔদ্ধত্য কেন আসিবে? আমি একটা কুক্কুর-তুল্য লোককেও দেবরাজ ইন্দ্রের সমান সম্মান দিয়া আদর করি, আর আমার শিষ্যেরা যাইবে অপরের স্বাধীনতায় হাত দিতে? আমি আগে স্বাধীন, তারপরে ধার্ম্মিক। আমি আগে

স্বাধীনতার পূজারী, তারপরে অন্য কিছুর অনুরাগী। আমি চিরকাল মানুষের স্বাধীনতার জয়গান গাহিয়াছি। আমার শিষ্যদের পক্ষে অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অতীব অসঙ্গত কার্য্য।

ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বী কোনও কোনও ধর্ম্মপ্রচারক-পুরুষ শিষ্যকে দীক্ষা দিবার পরে অব্রাহ্মণদ্বেষী করিয়া তুলিতেছেন, ইহা ত' চোখেই দেখিতে পাইতেছি। শিক্ষিত ও সমাজে সম্মানিত লোকগুলি একটী নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ্যবিলাসী গুরুর শিষ্য হইবার পর হইতে "অস্পৃশ্যতাই ভারতের গৌরব" বলিয়া মন্ত্রজপ সুরু করিয়াছে। একাজ সুদীর্ঘকাল চলিলে শূদ্রের সঙ্ঘবদ্ধ রোষ যে ভারতের ধর্ম্মীয় অচলায়তনের মূলদেশ পর্য্যন্ত ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু ধর্ম্মের নামে শূদ্রদ্বেষিতা দীর্ঘকাল চলিবে না, ইহা পরম সত্য। ক্ষণিকের এই আস্ফালন জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যাইবে এবং অবতারবাদের গহ্বরে পড়িয়া ইহা কয়েকজন পুরোহিতের মাত্র পুঁজি হইয়া থাকিবে। ইহা ভাবিয়া আমি ঐদিকে একেবারে উদাসীন নেত্রে তাকাইতেছি। যে যাহা ভাবিবার ভাবুক, যে যাহা বলিবার বলুক, যে যাহা করিবার করুক, সামঞ্জস্যহীন কর্ম্মোন্মাদ একদা নিজেতেই নিজের সমাধি-শয়ন রচনা করিয়া নিবে।

কিন্তু আমি তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ্যে অভিলাষী করিবার চেষ্টা করিয়া কি শেষে একদল দুর্ব্বিনীত উদ্ধত গুণ্ডার দলই গড়িব? না, তাহা হইবে না। দীক্ষা লইয়া তোমাদের সাধন করিতে হইবে

এবং যাহারা তোমাদের মতের মতী বা পথের পথী নহে, তাহাদের নিজ নিজ স্বাধীন রুচি সম্পর্কে নির্ব্বিকার থাকিতে হইবে। স্বরূপানন্দের কাছে মন্ত্র লওয়া সোজা কিন্তু স্বরূপানন্দের শিষ্য হওয়া সোজা নহে। স্বরূপানন্দ নিজে যাহা, তাহাই তোমাদিগকে হইতে হইবে,—nothing short of it will satisfy me.

যে দেশটায় আসিয়াছি, এই অঞ্চলটায় অতীতে কখনও আমি আসি নাই বা আমার কোনও প্রচারকও প্রেরিত হয় নাই। একেবারে কুমারী মৃত্তিকা, একেবারে অকর্ষিত ভূমি। কিন্তু দেশটায় কি আশ্চর্য্য উন্মাদনা দেখিতে পাইতেছি। পশ্চিমবঙ্গে ইহা অভিনব এবং অপ্রত্যাশিত। হইত কাছাড়, ত্রিপুরা বা আমাদের লখিমপুর জেলা, তবে ইহা স্বাভাবিক মনে করিতাম। কারণ, সেখানে আমি কাজ করিয়াছি, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাজ করিয়া যাইবার দুই একজন করিয়া একনিষ্ঠ কর্ম্মী আছে। এখানে সে কথা চলে না। তবু উন্মাদনা। কেন ইহা সম্ভব হইল? ছোটকে বড়, নীচকে উচ্চ, অনাদৃতকে আদৃত হইতে হইবে, ইহা বিধাতার বিধান বলিয়া। মানুষ একথা সুদূর হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে যে, নীচ বলিয়া কাহাকেও যিনি ঘৃণা করেন না, তিনি আসিতেছেন। কিন্তু ইহার অন্য তাৎপর্য্যও কি নাই? ছোটরা বড় হইবার জন্য তপস্যা করিবে, ইহাই কি এই উন্মাদনার আসল তাৎপর্য্য নহে? যে তপস্যা করে, যে সাধন-পরায়ণ, সে বিনীত হয়, নম্র হয়, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সে বিরত হয়, তাহার চরিত্র হইতে

ঔদ্ধত্য ও অনুচিত দাবীর ভাব দূর হয়। কেবল মন্ত্র নিলেই তোমরা শিষ্য হইয়া গেলে? সাধন করিলে তবে শিষ্য হইলে। মন্ত্র নিয়া দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়াইলেই গুরুদেবের কোনও সম্মান বাড়াইয়া দেওয়া হয় না।

আমার ধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্যের চেয়ে সম্মানজনক সদাচার আর কিছু নাই। বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রতিজনে নিজ নিজ অধিকার সামর্থ্য ও সুযোগ অনুযায়ী সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে ব্রহ্মচর্য্যের মর্য্যাদাকে নিজ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে। ইহা সর্ব্বপ্রথম কথা। একাজ করিলে ব্রাহ্মণশূদ্রের বিরোধের কোনও প্রশ্ন উঠিবার অবকাশ নাই।

আমার ধর্ম্মে স্বাবলম্বনের চেয়ে বড় আশ্রয় আর কিছু নাই, ভিক্ষান্ন প্রার্থনার চেয়ে হেয় আর কিছু নাই। ছোট বড় প্রত্যেককে, যে যতটা পারে, নিজ নিজ পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বাবলম্বী হইতে হইবে। একাজে মন দিলেও ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কলহের কোনও অবকাশ আছে বলিয়া মনে করি না।

আমার ধর্ম্মে জগজ্জনের মঙ্গলের জন্যই নিজের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ত্যাগ, তপস্যা এবং আরাধনা। শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে প্রত্যহ চারিবার উপাসনার সময়ে নামজপের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে জগন্মঙ্গল সঙ্কল্প করিতে হইবে। আমার প্রতিটি সন্তানের পক্ষে একাজ বাধ্যকর। একাজ যদি ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ,

ধনি-দরিদ্র প্রতিজনে করে, তবে তাহাতেও ব্রাহ্মণশূদ্রের কলহের কোনও ছিদ্রপথ আছে বলিয়া সুস্থ-মস্তিষ্ক কোনও লোকের কল্পনা করা সম্ভব নহে।

এতগুলি দামী কাজ ঘাড়ের উপরে তোমাদের চাপিয়া বসিয়া আছে। এতগুলি লাভজনক কাজ থাকিতে তোমরা অমুকের সংস্কারে আঘাত করিবে, তমুকের সম্মানে ব্যাঘাত করিবে, ইহা কি প্রকার কথা? যাহার হাতে কাজ নাই, সে ধানে চাউলে মিশাইয়া বাছিতে বসিবে। তোমাদের কাজ আছে, তোমরা ব্রাহ্মণকে জোর করিয়া হেঁটমুণ্ড করিতে যাইবার বৃথা অধ্যবসায়ে কেন প্রমত্ত হইবে? যিনি তোমার রাঁধা অন্ন খাইবেন না বলিতেছেন, তাঁহার স্বাধীন মতে কাজ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তোমার হাতের অন্ন খাইতে তিনি হয় ত' স্বেচ্ছায় আগ্রহী হইতে পারেন, এমন কি পাতের প্রসাদেও হয় ত' অনাগ্রহী থাকিবেন না, এমন একটী উচ্চস্তরে নিজের মন, বুদ্ধি, ধ্যান ও তপস্যাকে উঠাইতে চেষ্টা করিতেছ কি? আমি ত' চাহিয়াছি, আমি ত' চাহিতেছি, তোমাদিগকে ধ্যান-ধারণার, তত্ত্বোপলব্ধির, ঈশ্বরদর্শনের সেই উচ্চ কোটিতে আরোহণ করাইতে। তোমরা তাহার দিকে কতটুকু চেষ্টা করিতেছ, বল? কেহই যে চেষ্টা করিতেছ না, এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বলিতে চাহি না কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, প্রতিজনে কেন চেষ্টা করিবে না? প্রতিজনেই ত' আমার সন্তান।

একদল লোক সমাজ-মধ্যে নব-প্রবর্ত্তনে অনিচ্ছুক এবং

যাহা-কিছু প্রাচীন, তাহাকেই ধরিয়া রাখিতে আগ্রহী বলিয়াই এতগুলি রাষ্ট্রনৈতিক দুর্য্যোগের পরেও তোমরা তোমাদের বর্ত্তমান সংস্কৃতির ধারা লইয়া বজায় রহিয়াছ। তীর্থ, পুরোহিত, কুলগুরু, গ্রহাচার্য্য, স্মার্ত্ত পণ্ডিত প্রভৃতি যদি লোপ পাইয়া যাইত, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও আর বর্ত্তমানরূপে বিরাজ করিতে না,—হয় মুসলমান, নয় খ্রীষ্টান হইতে। তীর্থগুলি বাজে, পুরোহিতেরা প্রবঞ্চক, কুলগুরুরা স্বার্থপর, গ্রহাচার্য্যেরা কুসংস্কারের জনক, স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা সঙ্কীর্ণচেতা ইত্যাদি বলিয়া যে সকল অশ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করা হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গত কারণ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু ইঁহারা একটা অতি প্রাচীন সংস্কৃতিকে দারুণ ঝঞ্ঝাবর্ত্তের মধ্যেও কোনও প্রকারে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই বর্ত্তমান যুগের সমাজসংস্কারকেরা তাঁহাদের উদারতার বাণী শুনিবার জন্য কতকগুলি জ্ঞানপিপাসু কর্ণ পাইয়াছেন। নতুবা যাহাদের মধ্যে তাঁহাদিগকে জ্ঞানামৃত বর্ষণ করিতে হইত, তাহারা কৃপাণ হস্তে যুক্তির জবাব দিত, যুক্তির জবাব যুক্তিতে দিবার ধৈর্য্যটুকু দেখাইত না। এইসব বিচার করিয়া দেখ। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই সকল গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের শিষ্যরা তোমাদের সমাজটীকে পরোক্ষ ভাবে রক্ষা করিবার জন্য কি আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছেন। যেখানে কৃতজ্ঞতার অবকাশ আছে, সেখানে তোমরা মেজাজ দেখাইবার কুরীতি পরিহার কর।

আমার প্রদত্ত বিধানের বিরুদ্ধতা করিয়াও তোমরা সমবেত

উপাসনায় পক্কান্ন-ভোগ দিবেই দিবে, ইহা অনাচার, ইহা দ্রোহ। অনাচারে অশান্তি আসে, দ্রোহে আসে বিনাশ। সমবেত উপাসনায় বিশ্বের সকলকে একত্র পাইবার রহিয়াছে আকূতি, তোমরা তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে কেন পরিণত করিবে? সমবেত উপাসনায় ভোগ সাজানও একটা অতীব সাত্ত্বিক ব্যাপার। একটী মাছিও উহাতে যেন বসিতে না পারে, একটী পোকাও যেন উহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে না পারে, এত সতর্কতার সেখানে প্রয়োজন। প্রসাদ বিতরণে ধীরতা ও শৃঙ্খলা, প্রসাদ গ্রহণে ভক্তি ও নির্লোভতা, এগুলি অনুশীলনের জিনিষ। তোমরা তোমাদের সেকেলে হট্টগোলকে সমবেত উপাসনার মধ্যে আনিয়া জড় করিও না। সমবেত উপাসনা সম্পর্কে আমি যে বিধান দিয়াছি, তাহার মধ্যে কেহ নবপ্রবর্ত্তন করিও না। কারণ, আমার নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নহে, বিশ্বজনের ভিতরে প্রেমের প্রসারের জন্য ইহার আবির্ভাব। সমবেত অখণ্ড-উপাসনায় আমি তোমাদের পূজ্য বিগ্রহ বা অবতার নহি, আমি সকলের সহিত সমভাবে আসীন একজন সমসাধক মাত্র। ইহার উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয়ই সর্ব্বজনে প্রেম। যে আমাকে ভালবাসে না, আমি তাহাকেও ভালবাসিতে চাই। প্রেমই জীবনের সার, প্রেমই জীবনের সত্য, প্রেমই জীবনের সার্থকতা। প্রেমকে তোমরা লক্ষ্য কর, নিজ নিজ জিদ আর গোয়ার্ত্তুমি তোমরা ত্যাগ কর। প্রেমই বিশ্বকে বশ করিতে পারিবে,

জবরদস্তি দিয়া নহে। ভালবাসায়, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, স্নেহে আর প্রীতিতে যাহা করা যায়, যুক্তিতে, কথারপ্যাঁচে, গায়ের জোরে আর ভীতিপ্রদর্শনে তাহা করা যায় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

হিজলী প্রেমবাজার

১৫ই মাঘ, সোমবার, ১৩৭৪

(২৯-১-৬৮ ইং)

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মেদিনীপুর জেলার অভ্যন্তরে পূর্ব্বদক্ষিণ অঞ্চলে আসিয়া চংরাচক ও দশগ্রামে কর্ম্মী ছেলেদের সংগঠনের যোগ্যতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। দশগ্রামে তবু দুজন তিনজন আছে বা পাশাপাশি গ্রামে আরও কেহ কেহ কর্ম্মী আছে, কিন্তু চংরাচকে একা মন্মথ দাস, তাহার এক সহকারী দূরবর্ত্তী আর এক গ্রামের চিত্তরঞ্জন মাইতি। ইহাদের অশেষ শ্রম সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়াছে, চংরাচকে সম্ভবত ১৫৬০ জন এবং দশগ্রামে সুনিশ্চিত ১৯৯৯ জন নরনারী দীক্ষিত হইয়াছে উভয় স্থানেই জনসভায় দশহাজার হইতে পনেরো হাজার শ্রোতা হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকের মণ্ডলীগুলি দশগ্রামকে সংগঠন-কার্য্যে অশেষ সহায়তা করিয়াছেন কিন্তু চংরাচক বহুমুখী

উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ মন্মথকে সেই সহায়তাগুলি করিয়াছেন। অথচ ইহাদের কাহারও সহিত আমার এমন কি চিঠিপত্রেও পূর্ব্বপরিচয় নাই। গুণগ্রাহী চংরাচকের জনসাধারণকে ধন্য মানিতে হয়।

দশগ্রাম ও চংরাচকের কাছে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। মানবপ্রেম কত খানি গভীর থাকিলে শত শত লোক আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একটা মহদুদ্দেশ্যে কাজ করিতে পারেন, ভাবিয়া দেখ। ব্যক্তিগত তুচ্ছ কর্ত্তৃত্ব-বোধ পরিহার করিয়া তোমরা প্রকৃত সেবকের মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিতে শিখ।

আমি তোমাদের সম্বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি কিন্তু পাঠ করিবার অবকাশ হইতেছে না। কাল অপরাহ্ণ হইতেই দুরন্ত হৃৎকম্পন সুরু হইয়াছিল, আজ তাহাতে তীব্র বেদনার সংযোগ হইয়াছে। অদ্য অপরাহ্ণে ভাষণের প্রগ্রাম ছিল, জনসাধারণের আগ্রহ সত্ত্বেও তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছি। এখন ভাবিবার যে বলরামপুর, বাঁকুড়া, খাতড়া, আসানসোল, অণ্ডাল, আমেদপুর (বীরভূম) প্রগ্রাম শেষ করিয়া আসিতে পারিব কি না। প্রগ্রাম করিয়া বাতিল করিতে গেলে লোকে বিরক্ত হয়। লোকের মনে এই উদারতাটুকু নাই যে, যাহারা অকাতরে সারাবৎসর বিনা বিশ্রামে শ্রম করিতেছে, দরকার হইলে তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দিতে হইবে।

শরীরের অবস্থা যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে মনে হয়, তোমাদের অঞ্চলের প্রস্তাবিত ভ্রমণ-তালিকা আড়াই কি তিন মাস পিছাইয়া দিতে হইবে এবং কোনও কোনও স্থান বাদই দিতে হইবে। প্রগ্রামের একটা প্রস্তাব পাড়িলাম কি দায়ী হইয়া পড়িলাম কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, এই প্রগ্রামটী পাইবার যোগ্য হইবার মত শ্রম তোমরা অধিকাংশ স্থানেই কর নাই। সর্ব্বত্র তোমরা চাহিতেছ যে, আমি যাইবার পরে তোমরা সকল কাজ করিবে, আমি পৌছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরমানন্দে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিবে। ইহা যে তোমাদের কতবড় অপ্রেমিকতা, তাহা তোমরা আজও বুঝিতে পারিতেছ না। কবে ইহা বুঝিবে? আমি এই শরীরটা ছাড়িয়া দিবার পরে ত'? তোমাদের অনেকের দাবীর ঢং এমন যে শরীর যে অসুস্থ তাহা ট্রেণ বা বিমানে দেহত্যাগ করিয়া আমাকে প্রমাণ করিতে হইবে।

মেদিনীপুর জেলায় আরও গিয়াছি কিন্তু সেভাবে যাই নাই, যে ভাবে কাজ করিয়াছিলাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায়, যে ভাবে সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছি ত্রিপুরা রাজ্যে, যে ভাবে কাজ করিয়াছি কাছাড়ে। এবার মেদিনীপুর জেলার প্রকৃত আভ্যন্তর মূর্ত্তিটী আমার চখের সুমুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। স্থির করিয়াছি, শরীর সমর্থ থাকিলে, এই জেলাটার প্রতি প্রত্যন্তে প্রবেশ করিব, প্রতিটি উল্লেখযোগ্য স্থানে যাইব, প্রতিটি কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া জাগরণী

গীতি গাহিব। নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ ত' তোমাদের জেলাটা সম্পর্কে আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় কেন হইতেছে না? যে জেলায় অসংখ্য স্থানে পূর্ব্বে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই জেলাতেই এখন আর যাইবার আগ্রহ কেন অনুভব করিতেছি না? তোমরা দীক্ষা নেও, সাধন কর না। তোমরা মণ্ডলী গঠন কর কিন্তু তাহার ঐক্যবদ্ধতা রক্ষার জন্য চেষ্টা কর না। তোমরা আমাকে বারংবার নিজেদের মধ্যে পাইতে চাহ কিন্তু তাহা লোকের কল্যাণের জন্য নহে, নিজ নিজ নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ রূপে আমার সান্নিধ্যটুকুর অপব্যবহার করিবার অভিলাষে। এই জন্যই প্রকৃত কাজের সময়ে তোমাদের টিকির নাগাল পাওয়া যায় না, পরন্তু কর্ত্তব্যের আলোচনার সময়ে তোমাদের মুখ দিয়া খৈ ফোটার মতন প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি অজস্র ধারায় ছুটিতে থাকে।

তোমরা কি তোমাদের এই দোষগুলির সংশোধন করিবে? অহংকার বিসর্জ্জন না দিলে তাহা পারা কঠিন, প্রেম না আসিলে তাহা পারা অসাধ্য। তোমরা ক্ষমতাভিমানী, ইহা ক্ষমণীয় কিন্তু তোমরা প্রেমহীন, ইহার ক্ষমা কোথায়? প্রেম থাকিলে মানুষ প্রতি কর্ম্মে, প্রতি বাক্যে, প্রতি চিন্তায় তাহার প্রমাণ দিতে পারে। প্রেমের শক্তি অসীম। প্রেম আসিলে প্রেমের বন্যায় অন্য সব জঞ্জাল ভাসিয়া যায়। প্রেম সর্ব্বপাপহর, সর্ব্বতাপহর, সর্ব্ব-

বিক্ষেপহর। প্রেম নাই বলিয়াই তোমরা নিজেদের মধ্যে বৃথা কলহ কর। প্রেম নাই বলিয়াই তোমরা সংঘের বনিয়াদকে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে অক্ষম হইতেছ। প্রেম নাই বলিয়াই তোমরা এক এক জনে এমন অনেক অপরাধ করিতেছ, যাহা অন্য কোনও ক্ষমাহীন গুরুর শিষ্যেরা করিলে চিরতরে গুরুদেবের দ্বারা বর্জ্জিত হইত। প্রেমের অভাব তোমাদিগকে মনুষ্যত্বে হীন, অনুভবে দীন, আচরণে কাঙ্গাল করিয়া রাখিয়াছে।

তোমরা প্রেমের চর্চ্চা কি করিবে?

প্রেম আসে সাধন হইতে। প্রেম সাধন-কল্প-লতিকার অমৃতময় ফল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

বাহিরি (বীরভূম)
২৫শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৭৪
(৮-২-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। এতদিন নানা স্থান ভ্রমণে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারি নাই।

অখণ্ডের সমবেত উপাসনার মূল প্রতিপাদ্য এই যে, একমাত্র ওঙ্কারেই সর্ব্বমতের, সর্ব্বপথের, সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক মন্ত্রের পূর্ণ মিলন, পূর্ণ সমন্বয়, পূর্ণ সমাহার। সুতরাং সমবেত উপাসনায় অখণ্ডেরা অপর সকল মতের, পথের, সম্প্রদায়ের ভক্তদের নিয়া একত্র বসিতে পারেন। বিশেষ করিয়া কোনও সম্প্রদায়ের গুরু, ইষ্ট বা দেবতার মূর্ত্তি উপাসনার পূজাবেদীতে রাখিবার প্রয়োজনও নাই, সঙ্গতিও নাই। এজন্য অখণ্ডের সমবেত উপাসনা এমন স্থানে হওয়া উচিত, যেখানে সম্মুখে অন্য কোনও আচার্য্য, উপদেষ্টা, দেবমূর্ত্তি, অবতার রূপে পূজিত পুরুষ বা পূজাবিগ্রহ নাই।

কিন্তু অখণ্ডগণের অন্য মত, অন্য পথ, অন্য দেবতা, অন্য মূর্ত্তি, অন্য মন্ত্র বা অন্য তন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ নাই। সুতরাং তাহারা অন্য দেবমন্দিরের নাট-মন্দিরে সমবেত উপাসনা করিবার প্রয়োজন ঘটিলে তাহাতে কুণ্ঠা, দ্বিধা বা বিরক্তি পোষণ করিতে পারেন না। কিন্তু উক্ত মন্দিরের পূজা-বিগ্রহকে দক্ষিণে বা বামে রাখিয়া এমন ভাবে ওঙ্কারবিগ্রহ স্থাপন করিবেন, যেন চক্ষু খুলিলে তাঁহারা এখমাত্র প্রণববিগ্রহই দেখিতে পান। দেবতাদের মধ্যে বর্ণবিভাগ আছে। কোনও কোনও দেবতাকে দক্ষিণে রাখিলে সম্মান করা হয়, বামে রাখিলে অসম্মান প্রদর্শিত হয়। আবার কোনও কোনও দেবতাকে বামে রাখিলে সম্মান করা হয়, দক্ষিণে

রাখিলে অসম্মান করা হয়। সুতরাং এই ব্যাপারে উক্ত দেবমন্দিরের রক্ষক ও পূজকদের অভিপ্রায় দেখিয়া স্থির করিতে হইবে যে, সমবেত উপাসনায় উপস্থিত নর-নারীদের বামে ঐ দেববিগ্রহ বা মহাপুরুষের মূর্ত্তি থাকিবেন কি দক্ষিণে থাকিবেন। অখণ্ডদের নিকটে সকল দিকই ঈশ্বরের সৃষ্ট, সকল দিকেই দিক্‌পতি রূপে তিনিই বিরাজ করেন, সুতরাং উত্তরাস্য, দক্ষিণাস্য, পশ্চিমাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া তাঁহারা অবাধে নিজ নিজ ব্যক্তিগত উপাসনা বা সমবেত উপাসনা করিতে পারেন। ইহাতে বাধা নাই।

অখণ্ডদের সমবেত উপাসনা যখন সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোককে লইয়া করিবার যোগ্য উপাসনা এবং সকলকে লইয়া উপাসনা করাই যখন এখানে মূলগত উদ্দেশ্য, তখন সাধারণ ক্ষেত্রে কোনও সাম্প্রদায়িক মন্দিরের কোনও গোষ্ঠীবিশেষের দেবতা বা মহাপুরুষের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া এই উপাসনা না করাই উচিত। অখণ্ডেরা ভিন্ন কোনও মত বা পথের যৌক্তিকতা বা আবশ্যকতা অস্বীকার করে না কিন্তু সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলিবার ক্ষেত্রটীকে একটী ভাবী বিসম্বাদের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে চাহে না। তোমাদের ওখানে দেবতা-বিশেষের নাট-মন্দিরে সমবেত উপাসনা করিতে যাইতে যে কোনও কোনও অখণ্ড আপত্তি করিয়াছে, ইহার আসল কথাটুকু এই। তোমরা তাহাদের সদভিপ্রায়কে ভুল বুঝিয়া তাহাদের নিষ্ঠাবর্দ্ধক আচরণকে সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি বা বিদ্বেষ বলিয়া

ব্যাখ্যা করিও না। ইহা করিতে গেলে তোমরা অকারণে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। কোনও মতবাদকে নিরস্ত, ধ্বংস বা নির্ব্বাসিত করিবার জন্য অখণ্ড-বাদের আবির্ভাব ঘটে নাই। সকলকে সকলের সাথে মিলাইবার জন্যই ইহার আবির্ভাব এবং সকলের সহিত সকলের মিলন-সাধনের সমন্বয়-সূত্র অখণ্ডদেরই হাতে রহিয়াছে।

পৃথিবীতে নানা মত, নানা পথ থাকিবেই। মহারণ্যে বট, অশ্বত্থ, চন্দন আদি সহস্র প্রকারের বৃক্ষ থাকিবেই। এই বৈচিত্র্য বিধাতৃবিহিত, এই বৈচিত্র্য কেহই দূর করিয়া দিতে পারিবে না। যাহা আমরা পারিব, তাহা হইতেছে সকলের সকল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটা সমন্বয়ের বা ঐক্যবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। অখণ্ডবাদ বা অখণ্ড-ধর্ম্মাচরণ তাহাই করিতে চাহিতেছে।

অনেকের গৃহে কুলদেবতারা আছেন। এই সকল দেবতার পূজার ভাগ্য ভবিষ্যতে কি হইবে, এই প্রশ্ন করিয়াছ। আমি মনে করি, সেই দুশ্চিন্তা করিয়া আমাদের লাভ নাই। একদা ভারতে মিত্রের পূজা, বরুণের পূজা, ইন্দ্রের পূজা প্রচলিত ছিল। আজ সেই সকল দেবতার পূজার ভাবনা কে কোথায় করিতেছে? দেবতাদের ভাগ্য লইয়া দেবতারা থাকুন, মানুষ তাহার নিজের ভাগ্য ভাল করিয়া রচনা করিবার জন্য কি করিতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখুক। ইন্দ্র-বরুণাদির পূজার ভিতরে যেটুকু ছিল ঈশ্বর-বোধের উদ্দীপক, সেইটুকুই সেই পূজার আসল বস্তু। সেই

আসল বস্তুকে রক্ষা করিবার জন্য যেখানে যখন যেটুকু অন্য বস্তুর পরিত্যাগ প্রয়োজন, মানবাত্মা নিজ উৎকর্ষের পথে নিজ প্রেরণায় তাহা করিয়া যাইবে। পূর্ব্বপুরুষদের পূজিত প্রতিমা বা শিলামূর্ত্তি নিয়া পরবর্ত্তী পুরুষেরা কি করিবেন না করিবেন, তাহার চিন্তার দায়িত্ব পরবর্ত্তীদের হাতে ছাড়িয়া দাও। মানুষের ভবিষ্যৎকে শৃঙ্খলিত করিবার বিধান ত' আমি দিতে পারি না। যাহারা রুচি বোধ করে, তাহারা অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াও পূর্ব্বপুরুষের পূজিত দেবমূর্ত্তির পূজা অব্যাহত রাখিবে, যাহারা রুচিহীন, তাহারা ঐ ঐ মূর্ত্তি আমাকে সমর্পণ করিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে। ইহা ছাড়া অন্যরূপ নির্দ্দেশ আমি কি করিয়া দিতে পারি?

যাহা কিছু পুরাতন, তাহাই নির্ব্বিচারে বর্জ্জনীয় নহে এবং নির্ব্বিচারে রক্ষণীয়ও নহে। যাহা কিছু নূতন বলিয়া প্রতিভাত, তাহাই এক কথায় বরণীয় নহে কিম্বা এক কথায় পরিত্যাজ্যও নহে। আমি ভাল বা মন্দ কোনও নূতনের প্রতিই অত্যাকৃষ্ট নহি। জাতির আত্মার স্পন্দনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি সকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়াছি এবং সমবেত-অখণ্ড-উপাসনার মধ্যে তাহা পাইয়াছি। এই সমবেত- উপাসনাটীকে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিগত রুচিপ্রসূত নানাবিধ সংযোজন, সংমার্জ্জন, সংশোধন ও সংস্করণ হইতে তোমরা রক্ষা করিয়া চল। অখণ্ডের

সমবেত উপাসনা ভারতের শুধু নূতন একটী আধ্যাত্মিক ইতিহাসই রচনা করিবে না, ইহা নৈতিক, মানসিক, সামাজিক, এমন কি রাষ্ট্রিক ইতিহাসের কাঠামো রচনা করিবে । ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

১৭ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৭৪

(১-৩-৬৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শারীরিক ভাবে বড়ই উদ্বেগজনক অবস্থায় পড়িয়া আমি বাধ্য হইয়া বহুল-প্রচারিত একটী সুদীর্ঘ ভ্রমণের তালিকা অংশত বাতিল, অংশত স্থগিত করিয়া স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার আশায় পুপুন্‌কীর নির্বান্ধব মাটিতে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছি, এমন সময়ে ভ্রমর আসিয়া কাণে বার্ত্তা দিয়া গেল যে, রাজনৈতিক দলবিশেষের মন্ত্রীত্ব খতম হওয়াতে তোমরা তোমাদের মণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলে। এ সংবাদ কি সত্য হইতে পারে? সত্য হইবার পক্ষে আমি কোনও যুক্তি দেখি না, কারণ, যেদিন রাজনৈতিক দল-বিশেষের মন্ত্রীত্ব হঠাৎ খতম হইল, সেই দিন

তোমাদের রাজ্যের একটী মন্দিরেও দেবপূজা বন্ধ ছিল না, একটী মসজিদেও নমাজ পড়া বন্ধ ছিল না, গঙ্গাতীরে একটী পুণ্যস্নানার্থী ও অবগাহন না করিয়া গৃহে ফিরে নাই।

কিন্তু রাজনৈতিক দল-বিশেষের ক্ষমতাচ্যুতি হেতু তোমরা তোমাদের সামূহিক ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য বাদ দিয়াছ, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তোমরা অবনতির অতি নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছ। অখণ্ডের সমবেত উপাসনা দল-মত-নিরপেক্ষ সকল লোকের সম্মিলিত উপাসনা। অখণ্ডের প্রতিটি মণ্ডলী রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বসংঘর্ষের অতীত একটী প্রতিষ্ঠান। তোমরা ইহার মধ্যে রাজনীতির পঙ্কিলতাকে প্রবেশ করিতে দিবে? কে তোমাদিগকে এরূপ কাজ করিতে বুদ্ধি দিল? কেন তোমরা এমন কুবুদ্ধিকে আমল দিবে?

তোমরা যদি মণ্ডলীগুলির ভিতরে রাজনীতি ঢুকাও, তবে এমন সব মণ্ডলীকে আমি স্বীকার করিয়া নিতে অক্ষম হইব, এমন সব মণ্ডলীর উপর হইতে আমার অনুমোদন তুলিয়া লইব। মণ্ডলীর বাহিরে গিয়া যে যাহা ইচ্ছা করিবার কর, তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় কে হস্তক্ষেপ করিবে? আমি স্বাধীনতার পূজারী, জোর করিয়া কাহাকেও বশংবদ রাখিতে চাহি না।

কমিউনিষ্ট-মতবাদী যাহারা আমার শিষ্য হইয়াছে, তাহারা এক স্থানে গিয়া সমবেত উপাসনা করিবে, আর অমনি তাহার

নাম হইবে অখণ্ড-মণ্ডলী, ইহা নহে। কংগ্রেসী-মতবাদী যাহারা আমার শিষ্য হইয়াছে, তাহারা আর এক স্থানে যাইয়া সমবেত উপাসনা করিবে আর অমনি তাহার নাম হইবে অখণ্ডমণ্ডলী, তাহাও নহে। সুভাষবাদীদের মধ্যে যাহারা আমার শিষ্য হইয়াছে, তাহারা অপর একস্থানে যাইয়া সমবেত উপাসনা করিবে এবং অমনি তাহার নাম হইবে অখণ্ডমণ্ডলী, ইহাও নহে। রাজনৈতিক মতবাদ যাহার যাহা থাকিবার থাকুক গিয়া, সকল মতের সকল পথের লোকদের নিয়া একত্র সমবেত উপাসনায় বসিবার আগ্রহ লইয়া যে মণ্ডলী স্থাপিত হইবে, তাহার নাম অখণ্ডমণ্ডলী। সেই উপাসনাতে আমার বসিবার জন্য একখানা আসন থাকিবে,—হয় সর্ব্বাগ্রে, নয় সর্ব্বপশ্চাতে,—কারণ সকলের সমসাধক রূপে অনন্ত কাল আমি আমার এই আসনটীতে বসিয়া উপাসক-উপাসিকাদের কণ্ঠের সহিত নিজ কণ্ঠ, প্রাণের সহিত নিজ প্রাণ, মনের সহিত নিজ মন, বুদ্ধির সহিত নিজ বুদ্ধি, চেতনার সহিত নিজ চেতনা মিলাইব।

অখণ্ডমণ্ডলী কোনও রাজনীতির বশ নহে, মণ্ডলী প্রেমনীতির বশ। এই প্রেম, পরমপ্রেমময়ের সহিত সকলের যুগপৎ সম্বন্ধ-স্থাপনের মধ্য দিয়া সত্য হয় এবং সকলের সহিত সকলের অন্য দিক দিয়া সহস্র মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সকলের আধ্যাত্মিক একত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়া মুর্ত্তি লাভ করে। তোমরা ভ্রান্ত পথে চলিও না।

ভগবান আমাকে যে পরিমাণ শক্তি, সামর্থ্য, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাস দিয়াছেন, তাহাতে আমি কি ইচ্ছা করিলে যে-কোনও সময়ে একটা নিদারুণ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিতে পারিতাম না? ইংরাজ কি আমাকে অকারণে তরুণ কৈশোর হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত বারংবার বিনা বিচারে জেলে আটক করিয়া রাখিয়াছিল? কিন্তু রাজনীতি আমার পথ নহে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লব চলিয়া চলিয়া নানা পরিবর্ত্তন আসিবার পরেই আমার কাজ করিবার দিন আসিবে। সমবেত উপাসনাকে তোমরা রাজনীতির দ্বারা কলুষিত করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৭৪

(৮-৩-৬৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ যে, আমার পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ, পাদুকা ছিন্ন, গাত্র প্রাবরণ-বস্ত্রহীন এবং স্বাস্থ্য সঙ্কটাপন্ন, আর তাহা দেখিয়া স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, ব্যথায় ব্যাকুল

হইয়া তুমি আমার শয্যা, বস্ত্র, প্রাবরণী, পাদুকা আদি ক্রয় করিবার জন্য এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছ। তোমার প্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং নির্দ্দেশ দিয়াছি, তোমার অভিলষিত কাজে যেন তোমার প্রদত্ত অর্থ ব্যয়িত হয়। জানই ত' আমি নিজের নিকটে কোনও অর্থ রাখি না।

তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহা ঠিকই দেখিয়াছ, ভুল কিছু দেখ নাই।

বিগত দুর্ভিক্ষ-দমনের কালে আমি আমার ঘড়ি, চশমা ও লেখনীটী ব্যতীত যাবতীয় ব্যক্তিগত সামগ্রী বিক্রী করিয়া দিয়াছিলাম। জামা, জুতা, রুমাল, মোজা, গামছা, কম্বল, ছাতা, লাঠি, লেপ, তোষক কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কাছাড় ভ্রমণ কালে এগুলি আমার সবই পুনরায় আসিয়া গিয়াছে। তুমি সত্য স্বপ্নই দেখিয়াছ কিন্তু এখন আর এগুলির আমার প্রয়োজন নাই। তবু তোমার অর্থ আমি এই জিনিষগুলিতেই বিনিয়োগ করিব।

কিন্তু বাবা, আমি কি আমার একটা মাত্র পাঞ্চভৌতিক শরীরেই রহিয়াছি? চতুর্দ্দিকে যে লক্ষ কোটি নরনারীকে দেখিতে পাইতেছ, তাহাদের মধ্যেও কি আমিই নাই? তাহাদের অভাব, তাহাদের অভিযোগ, তাহাদের দুঃখ, তাহাদের বেদনা কি আমারই অভাব, আমারই অভিযোগ, আমারই দুঃখ, আমারই বেদনা নয়? আমি

যে বাবা তাহাদেরই প্রতিজনের মধ্য দিয়া তোমাদের প্রতিজনের সেবা পাইতে অভিলাষী। শুধু এই একটী আকৃতি লইয়াই ত' আমি দেশের পর দেশ আর জনপদের পর জনপদ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি।

পুপুন্‌কী অঞ্চলে এ বছর কতক ধান্য হইয়াছে। এই জন্যই ফাল্গুন মাসটা পর্য্যন্ত গরীব মানুষেরা পেট ভরিয়া খাইতেছে। কিন্তু গত পঁচিশ ছাব্বিশ দিন পুপুন্‌কীতে অবস্থান করিয়া যাহা দেখিলাম, গরীব লোকগুলিকে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিনটী মাস অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। আর একবার আমাকে জামা, জুতা, ছাতা, কাপড় বেচিতে যে হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার অন্নদান মানে ভিক্ষাদান নহে, আমার অন্নদান হইতেছে কর্ম্মদান। দানসত্র, অন্নসত্র, সদাব্রতের লক্ষ্য ও আদর্শের সহিত আমার অন্নদান-প্রচেষ্টার বেশ একটুকু পার্থক্য রহিয়াছে। মানুষের কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু রাখিয়া দান করিলে এই দানের দ্বারা তাহার সামর্থ্য হরণ করা হয়। অতীতে একথা ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু বর্ত্তমান যুগের প্রায় সকল সঙ্কটই অর্থনৈতিক। নৈতিক দিকও একটা আছে, যাহা তুচ্ছ করিবার নয়। গ্রহীতার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া দান করা জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সামিল।

সমস্যাগুলিকে আমি যে ভাবে চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছি,

তোমরাও সেভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পার কি না, দেখিও। গোঁজামিল দিয়া দেশব্যাপী দারিদ্র্যসমস্যার সমাধান হইবে না, হইতে পারে না। মনোভঙ্গীর আমূল সংস্কার চাই সর্ব্বাগ্রে।

পুপুন্‌কীতে ট্রাক্‌টার আসিয়া গিয়াছে। আসিয়াছে ট্রেইলার মাল টানিবার জন্য, আসিয়াছে কলের তিনটী রকমারি লাঙ্গল জমি চষিবার জন্য, জমি কাটিবার জন্য, জমি তৈরী করিবার জন্য। বিয়াল্লিশ হাজার টাকা লাগিল। * * * কিন্তু ইহা এক নির্বান্ধব দেশ। প্রতিষ্ঠান গড়িতেছি না যুদ্ধ করিতেছি। নূতন ট্র্যাক্‌টার আসিল, নূতন নূতন কৃষি-যন্ত্র আসিল, টাঙ্গির আঘাতে তাহার কোনও-না-কোনওটার একটুকু ক্ষতি করা চাই। ছাদ কর, ব্রীজ কর, দেওয়াল কর, কেহ-না-কেহ আসিয়া কিছুটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইবেই। ঔষধ বিতরণ কর, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে এটা ওটা নিরন্তর উধাও হইতে থাকিবেই। কাহাকে হলার চালাইতে শিখাইলে, সে গোপনে অর্দ্ধমণ তৈরী চাউল লুকাইয়া পাচার করিবেই। আশ্রমের পাইপগুলি রাত্রে রাত্রে হ্যাক-স দিয়া কাটিয়া চোরে চুরি করিতেছে, আশ্রমের হিতৈষী বলিয়া পরিচিত লোকদের ঘরে সে সব পাইপ চোরেরা অবাধে বিক্রয় করিয়া যাইতেছে বলিয়া শুনিতেছি। এ এক বিচিত্র বিরুদ্ধতা, যাহার দরুণ এখন আমাকে মটির তলা দিয়া পাইপ নিয়া যাইতে হইতেছে, চারিখানা লোহার ছড় আর প্রতিফুটে একটী করিয়া রিং দিয়া রিইন্‌ফোর্স্‌ড্

কংক্রিটের বীম তৈরী করিয়া তাহার মধ্য দিয়া পাইপলাইন টানিয়া নিয়া, যেন ডিনামাইটের সাহায্য ছাড়া আর কেহ এক ইঞ্চি পাইপ না খুলিতে পারে। আজ এখানে কাজ করিতেছি ত' কাল অন্য খানে এক যুদ্ধং-দেহি আসিয়া হাজির হইল, বাধ্য হইয়া আরব্ধ কাজ স্থগিত রাখিয়া সেই অন্যদিক্‌টাতেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইল। এই ভাবে আমি কাজ চালু রাখিয়াছি, এই ভাবে আমি তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছি, তবু ভাবিতেছি এদেশের গরীব লোকগুলিকে অন্নাভাবে মরিতে দিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ
বারাণসী
২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাজ ত' সমাধা করিবে ভালবাসার শক্তিতে। চালাকী আর হুজুগ দিয়া কি কাজ হইবে? নিজের অন্তরে সন্ধানী আলো ফেল। খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার ভালবাসার পুঁজী কতটুকু আছে।

কঠোর-কর্ম্মী লোকেরা কাজেই ব্যস্ত থাকে, অন্তরের ভালবাসা মানুষকে মুখের ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেখাইতে তাহারা পারে

না, তাহা ভালও বাসে না। তাহাদের প্রেম প্রকাশিত হয় সকলের স্বার্থে আত্মবিলোপ ও আত্মবিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া। গান আছে না, "বাহিরে রুদ্র ভিতরে শান্ত"? ইহাই তাহাদের অবস্থা।

কাজের কাজ যে করিবে, সে যদি মিষ্টি মধুর কথাও বলিতে পারে, তবে ত' সোনায় সোহাগা। কিন্তু যদি মধুরভাষী সে না হইতে পারে? সে যদি সহকর্ম্মীদিগকে তাহার সহিত সমান তালে অতি দ্রুত চলিতে বাধ্য করিবার জন্য তীব্র ও কর্কশ কণ্ঠে ডাক দেয়? তবে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে? যুদ্ধের সেনাপতির অন্তরে কি দয়া-মায়ার স্থান আছে? রণস্থলত্যাগীদিগকে সে কি আদর করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হা-কৃষ্ণ হা-গৌরাঙ্গ বলিয়া কাঁদে, না এই অপদার্থগুলিকে কোর্ট-মার্শাল করিয়া গুলি করিয়া মারিবার নির্দ্দেশ দেয়?

রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা যখন কূটনীতির চর্চ্চা করে, তকন তাহাদের রসনায় মধু, বচনে অমৃত, দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপ, নিঃশ্বাসে শত চম্পকের প্রাণমাতানো সৌরভ। কিন্তু অন্তরে তাহাদের বিষের পুটলী। যাহার সহিত মিত্রতা করিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতেছে, তাহাকে, তাহার রাষ্ট্রকে, তাহার দেশবাসীকে চিরতরে শৃঙ্খলিত করিয়া পদানত রাখিবার দুরভিসন্ধি সে করিতেছে অন্তরে পোষণ।

বল, দুই জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

প্রাণের মধুতে নিজেকে কর কাণায় কাণায় পূর্ণ, তার পরে স্বভাবের পথে নিজেকে বিকশিত কর। প্রেমের মূলে যে তরুর

বিকাশ, সেই তরুর ফুলে-ফলে বিষ থাকে না, সেই তরুর ফুল-ফল মৃত্যু করে হরণ, দুঃখ করে বারণ, প্রীতি করে বর্দ্ধন, আত্মীয়তার করে পরিপোষণ। প্রেমের বলে বলীয়ান হও। এর চেয়ে বলের অন্য কোনও বৃহত্তর উৎস তিন ভুবনে কোথাও নাই।

প্রেম লইয়া প্রচার কর। প্রেম লইয়া সংগঠন কর। প্রচার হইতেছে সানাই বা ক্লারিওনেটের মুখে ফুৎকার করিয়া অন্তরের ধ্বনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত করিয়া ধরা। সংগঠন হইতেছে, ব্যাগ-পাইপের থলির ভিতরে শ্বাসের বায়ু জমাইয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে সেই বায়ুকে বাঁশীর মুখ দিয়া নিঃসারিত করিয়া দিয়া, ধ্বনিকে শুধু প্রসার দেওয়াই নহে, তাহাকে দীর্ঘতর স্থায়িত্ব দেওয়া। দুরন্ত অস্থিরতায় আলোড়ন করার নাম সংগঠন নয়। তাহাকে আন্দোলন বলিতে পার। কখনো কখনো একটা বা দুইটা তীব্র আন্দোলনের পরে সংগঠন চালু করিতে যে সুবিধা হয় না, তাহা নহে। কিন্তু দীর্ঘকাল সংগঠনের পরে এবং সেই সংগঠনের ফলে যে আন্দোলন, তাহাতে হিমালয় উপড়াইয়া ফেলা যায়, সাগর শুকাইয়া দেওয়া যায়, অনন্ত আকাশের দূরত্বকে করামলকবৎ হস্তমুষ্টিবদ্ধ করা যায়, অসম্ভবকে সম্ভবকরা যায়। নদীর তুচ্ছ একটা ক্ষুদ্র চড়ায় যেমন দুই এক কণা করিয়া বালুকা জমিতে জমিতে সকলের অজ্ঞাতসারে একটা সুবৃহৎ দ্বীপ গড়িয়া ওঠে, তেমন পদ্ধতিতে ধীর প্রযত্নে সুসন্তর্পণে দীর্ঘকাল ধরিয়া মহান ভাবকে

মানুষের মনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লাগিয়া থাকার নাম সংগঠন। আমি সংগঠন চাহি, হুজুগ চাহি না,—একথা আমি বহুবার তোমাদের বলিয়াছি। সংগঠন সুযোগ সৃষ্টি করে, হুজুগ কোনও কোনও সময়ে সুযোগকে নষ্টও করে।

তোমরা যাহা কল্পনাও করিতে পার না, এত কাজ তোমাদের প্রতিটি অঞ্চলে তোমাদের করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কর্ম্ম নিজের ধর্ম্মেই নিজেকে ব্যাপক বিস্তার দিবে কিন্তু তোমাদিগকে আগে খুঁজিয়া নিয়া একটী কাজের খুঁটি ধরিতে হইবে। খুঁটি শক্ত করিয়া না ধরিতে পারিলে টাগ-অব-ওয়ার জমে না এবং ব্রহ্মচর্য্যের বল না থাকিলে খুঁটি শক্ত করিয়া ধরাও যায় না।

এই জন্যই বলি, তোমরা ব্রহ্মচারী হও। দেহে, মনে, প্রাণে বাক্যে ও ব্যবহারে তোমরা শক্তি-সঞ্চয়ের দিকে আগাইয়া চল। নিজেকে ক্ষয়িত ও খণ্ডিত করিয়া বিশ্বের সহিত নিজের অখণ্ড আত্মীয়তা উপলব্ধি কঠিন কাজ। কেহ কেহ হয়ত চিন্তাগত অভ্যাসের ফলে লিখিবার বা বলিবার কালে বিশ্বের সহিত নিজের একাত্মতা অনুভব করিতে পারেন কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের বল না থাকিলে তাহা চরিত্রের মধ্যে সদাপ্রতিষ্ঠিত একটী স্বাভাবিক সত্য বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত সম্পদ হইয়া ওঠে না। কাব্যের বিশ্বপ্রেম আর বাস্তব বিশ্বপ্রেমে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে জানিও।

প্রেমিক হইবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যে রুচি চাই, ব্রহ্মচারী হইবার

জন্যই প্রেমের সাধনা চাই। একটী আর একটীর অনুপূরক এবং প্রতিপূরক।

সমগ্র পৃথিবী আপন জনে ভরিয়া আছে কিন্তু তাহাদিগকে চিনিয়া নিতে হইবে। প্রজ্ঞানেত্র চাই। প্রজ্ঞা-নয়ন খুলিতে হইলে প্রেমের হৃদয় চাই। প্রয়োজন তোমাদের অনেক কিছুর নহে, প্রয়োজন তোমাদের মাত্র একটী বস্তুর। তাহার নাম প্রেম। ইহা আসিলে অদম্য কর্ম্মপ্রেরণা, অবিচল প্রজ্ঞা আপনা আপনি আসিবে। বারংবার বলি, তোমরা প্রেমিক হও।

আমার প্রত্যেকটী সন্তান এক একটী প্রেমাধার প্রোজ্জ্বল প্রদীপ হউক। তাহাদের ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কর্ম্ম, চেষ্টা, উদ্যম মানুষের সহিত মানুষের নৈকট্য স্থাপন করুক, ব্রহ্মাণ্ডের সকল দূরত্বকে তাহারা জয় করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ বারাণসী
২৫শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৭৪
(৯-৩-৬৮ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভগবানের নাম ছাড়া জীবনের পরম আশ্রয় আর কি আছে? প্রতিজনে নামের সেবা করিয়া আনন্দের আধার হও, আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি হও। নিজেরা আনন্দ-রসের মহাসমুদ্রে ডুব দিয়া আনন্দময় হও এবং স্পর্শ দিয়া, গায়ের বাতাসটুকু দিয়া, চখের দৃষ্টি দিয়া সকলের সকল বিষাদ হরণ কর, সকলকে জীবন-জোড়া দুঃখরাশি ভুলাইয়া দাও। নামই জীবনের পরম সার, নামই বিশ্বকে আপন করিবে, নামই দূরকে করিবে নিকট, অজানাকে করিবে জানা। নাম পরশমণি।

সকলে তোমরা নামরসের রসিক হও, নামধনের ধনী হও, নামকে সম্বল করিয়া সম্যক্ বলীয়ান্ হও। নাম কর অভিমান বর্জ্জন করিয়া, অহঙ্কার পরিহার করিয়া, বিশ্বের সকলের প্রতি ভালবাসা লইয়া। তোমাদের নামসেবা ব্যক্তিরও শক্তি বাড়াউক, সঙ্ঘেরও শক্তি বাড়াউক।

নামসেবা করিবে বলিয়াই জাগতিক কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিবে, ইহা কোনও কাজের কথা হইল না। ভগবানকে ভালবাসিব বলিয়া মা, বাবা, ভাই, বোন কাহারও প্রতি কর্ত্তব্য করিব না, ইহা কোনও সুযুক্তি নহে।

ভগবানকে ভালবাসিব বলিয়াই ত' ভগবানের সৃষ্ট জগতে আমার আগে যাহারা আসিয়াছে এবং আমার পরে যাহারা আসিবে, আমার সমসাময়িক কালে যাহারা আসিয়াছে, সকলের

প্রতিই আমার ভালবাসা বিদ্যমান থাকিবে, প্রত্যেকের প্রতিই আমার প্রেম বিস্তারিত হইবে।

তোমরা সকলে সকলকে ভালবাসিয়া মিলিত হও। যেখানে ভালবাসা, ভগবানও সেখানে। ভগবানের নামকে আমি ভালবাসি, ভগবানের জীবকে আমি ভালবাসি, সুতরাং নিশ্চিত জানিও, আমিও সেখানে। আমাকে কি ভালবাস? তাহা হইলে তোমাদের সকলের মিলন-পথে কুত্রাপি কোনও বাধার সৃষ্টি হইতে পারে না। আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেখানে মেকি, লোকদেখান ভান বা অসম্পূর্ণ, সেখানেই পরস্পরের দোষাবিষ্কার তোমাদের ঐক্যকে করে ক্ষুণ্ণ, মিলনকে করে একদেশদর্শী, দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর।

আমি কখনো কখনো নিজেকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি। তখন আর আমাতে দ্বিত্ববোধ, দ্বিত্বভাব, দ্বিত্বাভাস বা দ্বিত্বানুভূতি থাকে না। অপর সময় নিজেকে ভগবানের সহিত নানা সম্বন্ধে সম্বন্ধায়িত বলিয়া উপলব্ধি করি। কিন্তু সকল সময়েই আমি তোমাদের, এইটী বিশ্বাস রাখিও। আমি ইহকালেও তোমাদের, পরকালেও তোমাদের, জাগ্রতেও তোমাদের, নিদ্রায়ও তোমাদের, কর্ম্মেও তোমাদের, বিশ্রামেও তোমাদের, তোমরা আমাকে চাহিলেও আমি তোমাদের, না চাহিলেও তোমাদের। আমার সহিত তোমাদের সম্বন্ধ শাশ্বত এবং আমার উপরে তোমাদের অধিকার নিত্যকালের। কিন্তু আমি

একা তোমাদের কাহারও নহি, আমি সকলের জন্য প্রতিজনের, প্রতিজনের জন্য সকলের। এই বিশ্বাসটুকু প্রত্যয়ীভূত হইলে তোমাদের ইহকালেও পরাজয় নাই, পরকালেও নহে। প্রকৃত মিলনের ইহাই সত্য ভিত্তি।

পুত্রকন্যাগুলিকে তোমার গৃহীত সৎ মার্গে পরিচালিত কর। তুমি এক পথে, পত্নী অন্য পথে, পুত্রগণ তৃতীয় এক রাস্তায়, কন্যাগণ চতুর্থ এক রাস্তায়, এইরূপ হইতে দিও না। অবশ্য পরমেশ্বরের যাহা ইচ্ছা আছে, তাহাই ত' হইবে, তবু তুমি কদাচ ইহাদিগকে নানা মতে নানা পথে চলিতে দিতে পার না। প্রেম দিয়া, স্নেহ দিয়া, আশীর্ব্বাদ দিয়া, আদর দিয়া, যুক্তি দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, উৎসাহ দিয়া, উদ্দীপনা দিয়া, ইহাদিগকে তুমি তোমার গৃহীত নিঃস্বার্থ নিষ্কাম জগন্মঙ্গলের পথে টানিয়া আন। ইহাদিগকে নামে অনুরাগী কর।

শত্রু তোমার চারিদিকে ঘুরিতেছে, বেশ ত' সতর্ক থাক। ভয় পাইও না। সতর্কতা আর সাহস একই কথা। সতর্কতা সাহসের সলজ্জ রূপ। সাহস সতর্কতার প্রগল্‌ভ রূপ। সতর্কতাকে কাপুরুষতা বা ঈশ্বরে অবিশ্বাস বলিয়া ব্যাখ্যা করা অন্যায়। নির্ভয় থাকিয়া সৎপথে চলিতে থাক। শত্রুরা কি চিরকালই থাকিবে? কেহ লুপ্ত হইবে নিশ্চিহ্ন হইয়া। কেহ রূপান্তর পাইবে বান্ধবে পরিণত হইয়া। নামে বিশ্বাস রাখ, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। শত্রুর শত শত্রুতা মিত্রজনের কৃতিত্বে পরিণত হইবে।

জগতে শত্রু তোমার কেহই নাই। তুমি নিজে নিজের শত্রুতা যাহাতে না কর, তার দিকে দৃষ্টি দাও। দেহকে রাখ সংযত, মনকে রাখ আদর্শানুগত, মানুষ মাত্রেরই সহিত ব্যবহার রাখ প্রীতিস্নিগ্ধ, সর্ব্বজীবের প্রতি হও প্রেমভাবাপন্ন, কামনা কর সকলের কুশল, সম্পাদন কর সকলের হিত। বিপথে যাইবে না, জেদ কর। অন্যকে বিপথ হইতে টানিয়া আনিতে চেষ্টা কর। আপাততঃ শক্তি তোমার সীমাবদ্ধ। সুতরাং নিজ সাধ্যানুযায়ীই যাহা করিবার কর। জগতের সকলকে সেবা দিতে পারিলে না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইও না, যে কয়জনকে যতটুকু সেবা দিতে পার, ততটুকুই সরল মনে সহাস্য আননে দিলখোলা তৃপ্তি সহকারে দাও। সর্ব্বস্ব-দানই ত' তোমার ব্রত এবং লক্ষ্য কিন্তু এখনি তাহা না পার, দুঃখ কেন? যেটুকু যখন সর্ব্বজীব-শুভার্থে দিতে পার বিনা কঠোরতায়, সেইটুকু দিবার অভ্যাসটুকুর অনুশীলন করিয়া যাও। লোকে যে একদা ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিত, তাহা এই অনুশীলনটীকে বজায় রাখিবার জন্য।

সারাদিন নামজপ করিতে না পার ত' আফশোষ কেন? দিনে পাঁচ দশ মিনিট করিয়াই জপ কর না! অনুশীলনটুকু রাখিলে কিছু কাল পরে দেখিতে পাইবে, তোমার চেষ্টা ছাড়াই দিবারাত্রি অনুক্ষণ প্রতি কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে, জীবন-সংগ্রামের যত সব ক্ষুদ্র-বৃহৎ অবসরে মনে আর প্রাণে অবিরাম শুধু নামেরই গুঞ্জরণ

চলিতেছে। দানই বল আর সাধনাই বল, নিষ্ঠাশীল অনুশীলনের ইহা বাস্তব ও ব্যাপক সুফল। ব্যায়াম পাঁচদশ মিনিটই করিতে হয় কিন্তু তাহার সুফলটুকু চব্বিশ ঘণ্টাই পাওয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চবিংশ খণ্ড সমাপ্ত

"অখণ্ড অমৃতময়
নামে করি' দেহক্ষয়,
জীবন সার্থক হবে
মরণেও বিশ্বজয়।
মৃত্যু নাই, ধ্বংস নাই,
দুঃখ নাই তার তরে,
অবিরাম অনুক্ষণ
নামের যে সেবা করে।।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্[illegible]

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের [illegible]না

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযম[illegible]

সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে [illegible] ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহা[illegible] রল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভা[illegible] মের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ [illegible] র হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" [illegible] কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার-জীব[illegible] প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংয[illegible] "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী -২২১০১০

Collected by MUKHERJEE, TK, DHANBAD